শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)



নবম শ্রেণি





জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

Shrimp Culture and Breeding -2

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৪৯৯১২

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মো: শরীফ উদ্দিন
প্রফেসর ড. এ কে এম আজাদ শাহ
ড. মোহা. সাইনার আলম
হাসনাত জাহান
মো: আসাদুজ্জামান
ড. আনিচুর রহমান মৃধা
ড. ইন্দ্রানী ধর (সমন্বয়কারী)

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

আধুনিককালে শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। পৃথিবীর যেসব দেশ আজ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তাদের দিকে তাকালেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশের মতো অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশে কারিগরি শিক্ষার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সহায়ক এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর ক া যায়। কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নতির নজির গড়েছে বিশ্বের অনেক দেশ। এশিয়ার চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল প্রমাণ। জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তারে সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষার জন্যে পৃথক অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই শিক্ষার জন্যে যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল স্তরে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অধিকতর সম্প্রসারণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতাকে বিবেচনায় নিয়ে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ট্রেডের বইগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের কর্মবাজারের চাহিদাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বায়নের এই যুগে গোটা বিশ্ব এখন অখণ্ড এক কর্মবাজার। বর্তমানে দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকলে যেকোনো দেশের মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে পারে। বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তার হিস্যা যত বাড়াবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত গতিশীল হবে। বাংলাদেশের বিশেষায়িত অনেক শিল্পে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সরবরাহের লক্ষ্যকেও বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আওতা থেকে কারিগরি শিক্ষার বই বাইরে নয়। ভোকেশনাল ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৭ সাল থেকে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো সংশোধন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-কে। এনসিটিবি নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন ও সংশোধন সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে বইগুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি বই উন্নত মানের কাগজ ও চার রঙা প্রচ্ছদ সহকারে ছাপা হয়েছে। এতে বইগুলোর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ। পূর্ব ও পরবর্তী শ্রেণির পঠিত বিষয়সমূহের সাথে যৌক্তিক সংযোগ বিধানপূর্বক বইটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ট্রেডের এই বইটি প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যাতে অনুকূল হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। বইটি যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের স্বকর্মসংস্থান ও সম্মানজনক জীবিকার্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সাবলীল ভাষায় লেখা বইটিতে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

প্রথম অধ্যায়

গলদা চিংড়ির জীববিদ্যা

Biology of Golda Prawn



চিংড়ি বাংলাদেশের একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের দেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর এবং বিশাল উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে চিংড়ি চাষের বিপুল সম্ভাবনা। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির ভূমিকা মৎস্য খাতের মধ্যে অন্যতম। পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে সমগ্র বিশ্বে চিংড়ির জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। সারা বিশ্বে চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের চিংড়ি চাষিদের মাঝেও শুরু হয়েছে অধিক পরিমাণে চিংড়ি উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। দেশের চিংড়ি চাষের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে বলেই দ্রুত চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গলদা ও বাগদা এই দুইটি প্রজাতির চিংড়িই প্রধানত চাষ হয়ে থাকে। গলদা মিঠাপানির পুকুর-দিঘী ও ঘের এবং বাগদা উপকূলীয় এলাকায় চাষ হয়ে থাকে। চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য হওয়ায় চিংড়ি চাষে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব জানতে পারব।
- গলদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ শনাক্ত করতে পারব।
- বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গলদা চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় শনাক্ত করতে পারব।
- বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পুরুষ ও স্ত্রী গলদা চিংড়ি শনাক্ত করতে পারব।

১। বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ

২০২১-২২ সালের তথ্যমতে নদী মাতৃক এই বাংলার সমৃদ্ধ জলজ সম্পদে রয়েছে প্রায় ৮.৪৪ লক্ষ হেক্টর বদ্ধ জলাশয়। এ দেশের স্বাদুপানিতে ২৪ প্রজাতির চিংড়ি ও লোনা পানিতে ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশের সমগ্র মিঠা পানি ও উপকূলীয় অঞ্চলে স্বল্প লোনা পানি উপযোগী হলেও উপকূলীয় জেলাগুলোর বাইরে এখন পর্যন্ত চিংড়ি চাষ বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারিত হয়নি। কারণ উপকূলীয় অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও পানির গুণাবলি চিংড়ি চাষের জন্য বেশী সহায়ক ও উপযোগী। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের গলদা চিংড়ি খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ও কক্সবাজার এলাকায় ব্যাপক হারে বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি গলদা চিংড়িরও চাষ করা হয়। বর্তমানে উক্ত ৪টি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বাগদা চিংড়ির পাশাপাশি আধা নিবিড় পদ্ধতির গলদা চিংড়ির খামার গড়ে উঠেছে।

১.১ গলদা চিংড়ির অংগসংস্থান

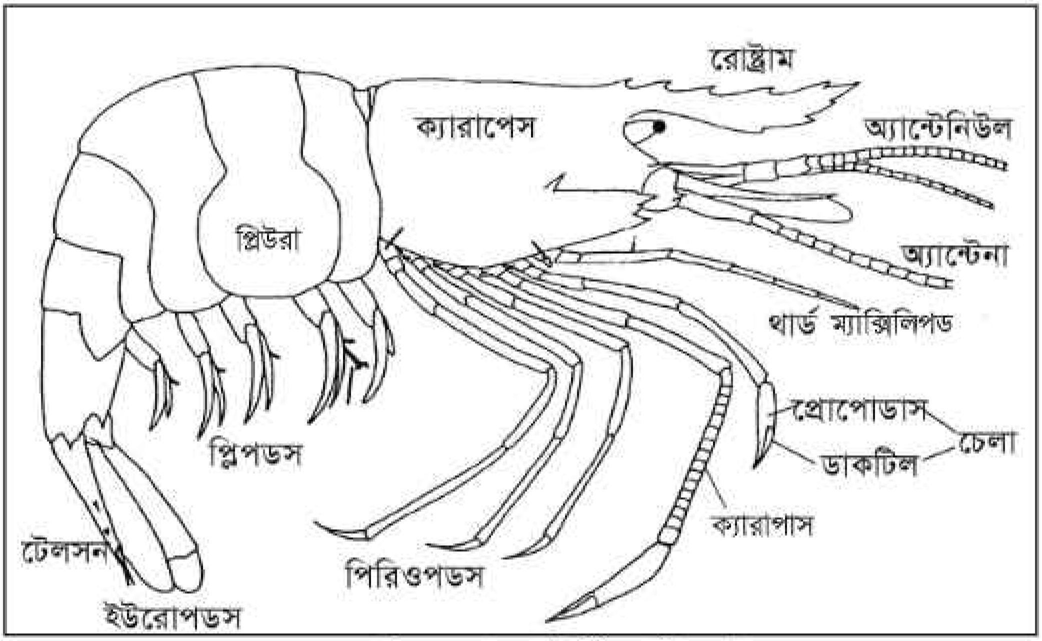
১.১.১ গলদা চিংড়ির বাহিক্য গঠন ও অভ্যন্তরীণ অংগসমূহ

গলদা চিংড়ি একটি অমেরুদন্ডী প্রাণী। এদের দেহ শক্ত কাইটিনের আবরণে ঢাকা, যাকে বহিঃকঙ্কাল বলে। গলদা চিংড়ির দেহ মুলত দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ শিরোবক্ষ (Cephalothorax) শির বা মাথা এবং বক্ষাঞ্চল (Thorax) এর সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয় অংশ উদারাঞ্চল (Abdomen)। শিরোবক্ষ অঞ্চলটি একটি শক্ত আবরণ বা ক্যারাপেস দ্বারা ঢাকা থাকে।

গলদা চিংড়ির দেহে মোট ১৯টি খন্ড রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি খন্ড মস্তক অঞ্চলে, ৮টি বক্ষাঞ্চলে ও ৬টি উদরাঞ্চলে অবস্থিত। ভ্রূণ অবস্থায় এর দেহে ২০টি খন্ড থাকে। এর মধ্যে ১ম খন্ডটি পরবর্তীতে দুদিকে চক্ষুবৃন্ত গঠন করে বিধায় ভ্রূণ পরবর্তী অবস্থায় ১৯টি খন্ড দৃশ্যমান থাকে। গলদা চিংড়ির মাথা ও বুককে এক সঙ্গে শিরোবক্ষ বলা হয়।

শিরোবক্ষের পিছনেই উদর অবস্থিত। উদর ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে টেলসন বা লেজে শেষ হয়েছে। টেলসনের উভয় পার্শ্বে পুচ্ছ পাখনা বা ইউরোপড (Uropod) অবস্থিত। চিংড়ির বহিরাবরণ কাইটিন নামক খোলস দিয়ে আবৃত যা ক্যালশিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত। এই খোলসগুলো চিংড়ির দেহের প্রতিটি অংশকে ঢেকে রাখে এবং একটি খোলস অপর খোলসের সঙ্গে একটি সন্ধিল পর্দা (Arthrodial membrane) দিয়ে সংযোগ রক্ষা করে। ফলে খোলসগুলো সহজেই প্রয়োজনে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে। চিংড়ির খোলসের অনেকগুলো স্তর আছে। একেবারে উপরের স্তরটি শক্ত ও কোষবিহীন। শক্ত স্তরের নিচে একপ্রস্থ কোষ অবস্থিত। কোষের স্তরে রসগ্রন্থি বিদ্যমান। স্কেলেরাইট (Sclerite) দ্বারা চিংড়ির প্রতিটি দেহখন্ড আবৃত থাকে। উদরে প্রধানত দু'টি স্কেলেরাইট অবস্থিত; পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছোট খন্ডটিকে প্লিউরন (Pleuron) বলা হয়।

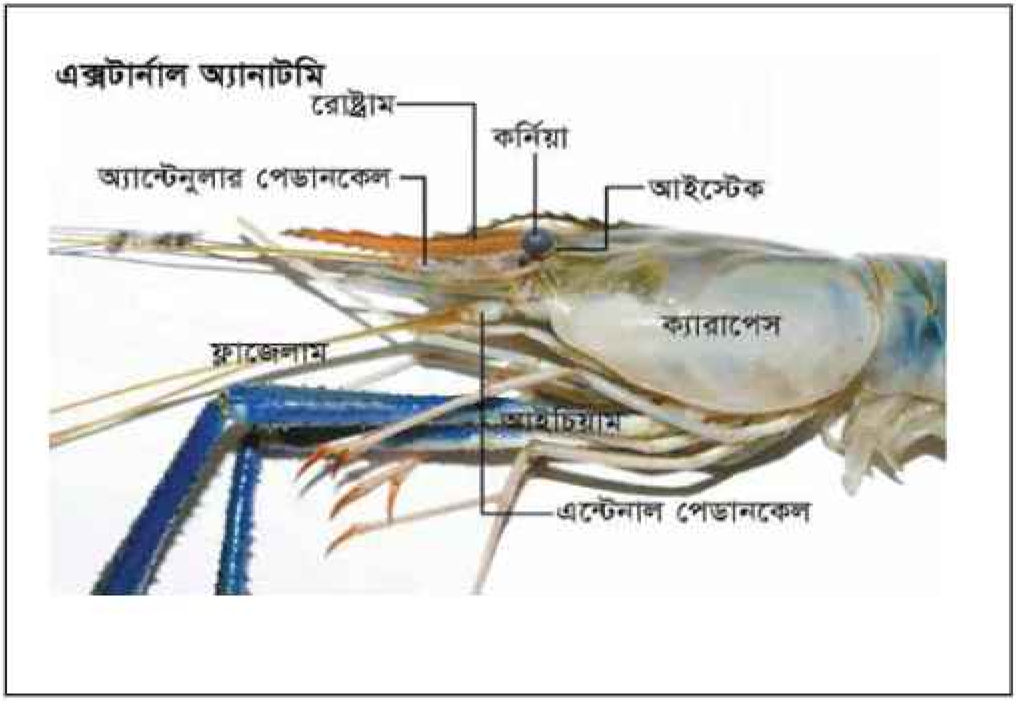
২০২৫



চিত্র-১.১: গলদা চিংড়ির বাহিক্য গঠন

চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্টাদেশাবরণ (Dorsal shield) বা শিরোবর্ম দ্বারা ঢাকা থাকে যা ক্যারাপেস (Carapace) নামে পরিচিত। পৃষ্টদেশের আবরণ উভয় পার্শ্ব হতে নিচের দিকে সম্প্রসারিত হয়ে ফুলকার উভয় দিকে একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণকে ব্রঙ্কিওস্টেগাইট (Branchiostegite) বলা হয়। এই আবরণ চিংড়ির শ্বাসঅঙ্গ বা ফুলকাকে রক্ষা করে। পৃষ্ঠদেশের আবরণ হতে মধ্যরেখা বরাবর একটি অংশ সামনের দিকে ক্রমশ লম্বা হয়ে পার্শ্ব চাপা ও ঊর্ধ্বমুখী সরু করাতের মতো সম্প্রসারিত হয়েছে যা রোস্ট্রাম (Rostrum) নামে পরিচিত। এই রোস্ট্রাম ক্যারাপেসের সম্মুখভাগে অবস্থিত। উপরের ও নিচের কিনারায় খাঁজ কাটা থাকে।

চিংড়ি রোষ্ট্রামের সাহায্যে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। রোষ্ট্রামের গোড়ার উভয় পার্শ্বে ছোট দুইটি কন্টক থাকে। সামনের কন্টকটিকে অ্যান্টেনাল কন্টক (Antennal spine) ও পিছনের কন্টকটিকে যকৃৎ কন্টক (Hepatic spine) বলা হয়। রোষ্ট্রামের গোড়ার উভয়দিকে একটি করে সবৃন্তক পুঞ্জাক্ষি (Stalked compound eye) অবস্থিত। বৃন্তের সাহায্যে চিংড়ি পুঞ্জাক্ষিকে চারিদিকে ঘুরাতে সক্ষম হয়। শিরোবক্ষের অঙ্কীয়দেশের অগ্রভাগে ছোট মুখ অবস্থিত। মুখের সামনের উপরের অংশকে লেব্রাম (Labrum) বা উর্ধ্বোষ্ট ও নিচের অংশকে লেবিয়াম (Labium) বা নিম্নোষ্ঠ বলে। চিংড়ির লেজের অঙ্কীয়দেশে পায়ু অবস্থিত। চিংড়ির উদরের পঞ্চম উপাঙ্গের গোড়ার ভেতরের দিকে পুরুষ চিংড়ির জনন রন্ধ্র এবং তৃতীয় উপাঙ্গের ঠিক একই স্থানে স্ত্রী চিংড়ির জনন রন্ধ্র উন্মুক্ত হয়।



চিত্র-১.২: গলদা চিংড়ির রোস্ট্রাম ও মাথার বিভিন্ন উপাঙ্গ

১.১.২ চিংড়ির উপাঙ্গসমূহ

শির-উপাঙ্গ (Cephalic appendage)

শির-উপাঙ্গ মোট পাঁচ জোড়া। এগুলো চিংড়ির দেহের ২য় থেকে ৬ষ্ঠ দেহখন্ডাংশে অবস্থান করে।



চিত্র-১.৩: চিংড়ির শির-উপাঙ্গ: অ্যান্টিনিউল (Antennule) এবং অ্যান্টেনা (Antenna)

এক. অ্যান্টিনিউল (Antennule)

- চিংড়ির দেহের প্রথম জোড়া উপাঙ্গ হচ্ছে অ্যান্টিনিউল যা পুঞ্জাক্ষি বৃন্তের নিকটে অবস্থিত।
- চিংড়ির প্রথম জোড়া উপাঙ্গ দেহের দ্বিতীয় খন্ডক থেকে উদ্ভূত হয় (ভ্রূণাবস্থায় প্রথম যে খন্ডক আত্মপ্রকাশ করে তাতে কোন উপাঙ্গ থাকে না)।
- অ্যান্টিনিউলের প্রোটোপোডাইট তিনটি ধারাবাহিক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত। যথা- প্রিকক্সা (Precoxa), কক্সা (Coxa) ও বেসিস (Basis)।
- চিংড়ির ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ স্ট্যাটোসিস্ট (Statocyst) প্রিকক্সার ভিতরের গহ্বরে অবস্থিত।
- কক্সা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং সিলিন্ডার আকৃতির।
- বেসিস তুলনামূলকভাবে লম্বা যা বহু গাঁটযুক্ত দুইটি ফ্লাজেলা বহন করে।
- দুইটি ফ্লাজেলার মধ্যে বাইরেরটি আবার দুইটি অসমান অংশ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে বড়টি স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে এবং ছোটটি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

দুই. অ্যান্টেনা (Antenna)

- মৌখিক ও তৃতীয় দেহখন্ডকের একজোড়া উপাঙ্গের নাম হচ্ছে অ্যান্টেনা।
- এর প্রোটোপোডাইট দুইটি ধারাবাহিক অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- কক্সা ও বেসিস।
- প্রোটোপোডাইট স্ফীত কারণ এর ভেতরে রেচন অঙ্গ থাকে যা বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে।
- বেসিস হতে দুইটি শাখা বের হয়েছে যার একটি স্কোয়ামা (Squama) বা স্কেল (Scale) এবং অন্যটি লম্বা, সরু আকৃতির ফ্লাজেলাম (Flagellum) [বহুবচনে ফ্লাজেলা, Flagella]।
- সাঁতারের সময় স্কোয়ামা ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে এবং ফ্লাজেলাম স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

তিন. ম্যান্ডিবল (Mandible)

- চিংড়ির ৪র্থ দেহখন্ডক ও অগ্রমৌখিক উপাঙ্গ হচ্ছে ম্যান্ডিবল যা মোটা, শক্ত, সংখ্যায় একজোড়া ও মুখের উভয় পাশে অবস্থিত।
- প্রতিটি ম্যান্ডিবল কক্সা নিয়ে গঠিত যা শক্তিশালী চোয়াল গঠন করে।
- এর প্রোক্সিমাল (Proximal) অংশ চামচ আকৃতির যা এপোফাইসিস (Apophysis) নামে পরিচিত এবং ডিস্টাল (Distal) অংশ নিরেট মস্তক গঠন করে।

- মস্তকের একটি অংশ চ্যাপ্টা যা কর্তন উপাঙ্গ (Incisor process) হিসেবে বিবেচিত এবং এখানে তিনটি দাঁত খুব কাছাকাছি থাকে।
- মস্তকের অন্য অংশটি ভোঁতা যা পেষক উপাঙ্গ (Molar process) হিসেবে বিবেচিত এবং এখানে পাঁচ-ছয়টি হলুদ বা বাদামী রংয়ের দাঁত থাকে।
- ম্যান্ডিবলের প্রধান কাজ হচ্ছে খাবারকে খন্ড খন্ড বা পেষণ করা। খাদ্য গ্রহণেও ম্যান্ডিবল সহায়তা করে।



চিত্র-১.৪: চিংড়ির শির-উপাঙ্গ: ম্যান্ডিবল (Mandible), ম্যাক্সিলুলা (Maxilula) এবং ম্যাক্সিলা (Maxilla)

চার. ম্যাক্সিলুলা (Maxilula)

- চিংড়ির ৫ম দেহখন্ডকের উপাঙ্গের নাম ম্যাক্সিলুলা যা চিংড়ির সবচেয়ে ছোট উপাঙ্গ এবং সংখ্যায় একজোড়া।
- তিনটি পাতলা স্বচ্ছ আঁশের মত অংশ নিয়ে ম্যাক্সিলুলা গঠিত।
- পাতলা তিনটি অংশের মধ্যে দুইটি প্রোটোপোডাইটের প্রতিনিধি যা ভিতরের দিকে চোয়াল হিসেবে থাকে এবং ন্যাথোবেস (Gnathobase) নামে পরিচিত।
- এর এন্ডোপোডাইট বাঁকানো এবং এক্সোপোডাইট অনুপস্থিত।
- এটি খাবারকে ছোট ছোট করতে সাহায্য করে। এমন কি খাবারকে মুখে প্রবেশ করাতেও সহায়তা করে।

পাঁচ. ম্যাক্সিলা (Maxilla)

- চিংড়ির ষষ্ঠ দেহ খন্ডকের উপাঙ্গ জোড়া হচ্ছে ম্যাক্সিলা যা পাতলা পাতার মত এবং ম্যাক্সিলুলা অপেক্ষা বড়।

- অতি ছোট কক্সা ও তুলনামূলক বড় বেসিস নিয়ে প্রোটোপোডাইট গঠিত।
- অন্যদিকে এর এন্ডোপোডাইট ছোট।
- আকারে অনেকটা বড় ও হাত পাখার মত এক্সোপোডাইট উপস্থিত যাকে স্ক্যাফোনাথাইট (Scaphognathite) বলে।
- চিংড়ির দেহে বিদ্যমান ম্যাক্সিলা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে সাহায্য করে।

বক্ষ-উপাঙ্গ (Thoracic appendage)

বক্ষ-উপাঙ্গ মোট আট জোড়া। এগুলো চিংড়ির দেহের ৭ম থেকে ১৪তম দেহখন্ডাংশে অবস্থান করে।

এক. প্রথম ম্যাক্সিলিপেড (First Maxillipede)

- চিংড়ির ৭ম দেহখন্ডকের উপাঙ্গ জোড়া হচ্ছে ১ম ম্যাক্সিলিপেড যা ম্যাক্সিলার পেছনে অবস্থিত।
- এটি ম্যাক্সিলিপেড গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট।
- এর প্রোটোপোডাইট কক্সা ও বেসিস নিয়ে গঠিত।
- কক্সার বাইরের দিকে দ্বিখন্ডিত পাতার মত এপিপোডাইট দেখা যায়।
- বেসিস থেকে এন্ডোপোডাইট ও এক্সোপোডাইট উদ্ভূত হয়।
- মুখ হতে বর্জিত খাবার দূরীকরণ, খাবার কাটা-ছেঁড়া ও শ্বসনে যথাক্রমে এক্সোপোডাইট, প্রোটোপোডাইট এবং এপিপোডাইট সহায়তা করে।



চিত্র-১.৫: চিংড়ির বক্ষ-উপাঙ্গ: প্রথম ম্যাক্সিলিপেড (First maxillipede), দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Second maxillipede) ও তৃতীয় ম্যাক্সিলেপেড (Third maxillipede)

২০২৫

দুই. দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Second Maxillipede)

- চিংড়ির ৮ম দেহখন্ডকের উপাঙ্গ হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড যা প্রথম ম্যাক্সিলিপেড এর পেছনে অবস্থিত।
- এর প্রোটোপোডাইট কক্সা ও বেসিস নিয়ে গঠিত।
- একটি ছোট এপিপোডাইট ও একটি ফুলকা (Gill) কক্সার বাইরের দিকে সংযুক্ত থাকে।
- এর এন্ডোপোডাইট পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত যথা- ইস্চিয়াম (Ischium), মেরাস (Merus), কারপাস (Carpus), প্রোপোডাস (Propodus) ও ডাকটাইলাস (Dactylus)।
- এক্সোপোডাইট চাবুকের মত লম্বা।
- দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড এর কাজ হল খাবার গ্রহণ ও শ্বসন।

তিন. তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড (Third Maxillipede)

- চিংড়ির নবম দেহখন্ডক থেকে উদ্ভূত একজোড়া উপাঙ্গই হচ্ছে তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড।
- প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড এর চেয়ে তুলনামূলক বড়।
- এপিপোডাইট কক্সার বাইরের দিকে অবস্থিত।
- এন্ডোপোডাইট তিনটি খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত। যথা- প্রথম অংশ ইস্চিয়াম (Ischium) ও মেরাস (Merus) একত্রে, মধ্যাংশ কারপাস (Carpus) এবং শেষাংশ প্রোপোডাস (Propodus) ও ডাকটাইলাস (Dactylus) একত্রে গঠিত হয়।
- অন্যদিকে এক্সোপোডাইট অখন্ডিত, লম্বা ও সিলিন্ডার আকৃতির।
- তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেডের এক্সোপোডাইট গমনে সহায়তা করে। এছাড়াও খাবার গ্রহণ ও শ্বসনেও সহায়তা করে।

হাঁটার উপাঙ্গ (Walking leg)

চিংড়ির ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম এই পাঁচ জোড়া বক্ষ উপাঙ্গ হাঁটার উপাঙ্গ বা পেরিওপোড (Pereopod) নামে পরিচিত। এগুলো যথাক্রমে চিংড়ির ১০ম থেকে ১৪তম দেহখন্ডাংশে অবস্থান করে। হাঁটার উপাঙ্গগুলো সাতটি ধারাবাহিক খন্ডাংশ নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে প্রোটোপোডাইটের অংশ দুইটি যথা- কক্সা ও বেসিস এবং এন্ডোপোডাইটের অংশ পাঁচটি যথা- ইস্চিয়াম, মেরাস, কারপাস, প্রোপোডাস ও ডাকটাইলাস।



চিত্র-১.৬: চিংড়ির বক্ষ-উপাঙ্গ: ১ম ও ২য় হাঁটার উপাঙ্গ (Walking leg or Chelate leg)

১ম হাঁটার উপাঙ্গ (First walking leg or Chelate leg)

- চিংড়ির দশম দেহখণ্ডাংশ থেকে উদ্ভূত।
- প্রথম হাঁটার উপাঙ্গের শেষ খন্ডাংশ (ডাকটাইলাস, Dectylus) প্রোপোডাসের সাথে যুক্ত না থেকে এর নিকটে অবস্থান করে।
- এর শেষভাগ বাঁকানো এবং দেখতে সাঁড়াশির মত যা চেলা (Chela) নামে পরিচিত।
- কয়েকটি দাঁতের মত গঠন সাঁড়াশির ভেতরের দিকে দেখতে পাওয়া যায়।
- খাবার গ্রহণ, আত্মরক্ষা ও প্রতিপক্ষকে দমনের কাজে সহায়তা করে।

২য় হাঁটার উপাঙ্গ (Second walking leg or chelate leg)

- চিংড়ির ১১তম দেহখণ্ডাংশ থেকে উদ্ভূত।
- চিংড়ির দেহের দ্বিতীয় হাঁটার উপাঙ্গ অনেক বড় এবং শক্তিশালী।
- অসংখ্য তির্যক আকৃতির কণ্টক এই উপাঙ্গের ইস্চিয়ামে থাকে।
- সমবয়সী পুরুষ চিংড়ির এই উপাঙ্গ স্ত্রী চিংড়ি অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল।
- অনেক সিটা ও কন্টক এ উপাঙ্গের সাঁড়াশিতে দেখতে পাওয়া যায়।
- খাবার সংগ্রহ ও গ্রহণ, আত্মরক্ষা এবং প্রতিপক্ষকে দমনে সহায়তা করে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হাঁটার উপাঙ্গ (Third, Fourth, Fifth walking or Non-chelate leg)

- এই উপাঙ্গগুলো প্রায় একই রকম এবং যথাক্রমে ১২, ১৩ ও ১৪তম দেহখন্ডাংশ থেকে উদ্ভূত।
- এই উপাঙ্গগুলোর মধ্যে সাঁড়াশি (Chelate) অংশটি অনুপস্থিত।
- অর্ধচন্দ্রাকৃতির স্ত্রী জনন ছিদ্র স্ত্রী চিংড়ির তৃতীয় হাঁটার উপাঙ্গের গোঁড়ায় অবস্থিত।
- পুংজনন ছিদ্র পুরুষ চিংড়ির পঞ্চম হাঁটার উপাঙ্গের গোঁড়ায় অবস্থিত।



চিত্র-১.৭: চিংড়ির বক্ষ-উপাঙ্গ: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হাঁটার উপাঙ্গ (Third, Fourth and Fifth walking leg or Non-chelate leg)

উদর-উপাঙ্গ (Abdominal appendage)

চিংড়ির ছয় জোড়া উদর-উপাঙ্গকে প্লিওপোড (Pleopod) বা সন্তরণী উপাঙ্গ বলে। এদের প্রত্যেকের প্রোটোপোডাইট কক্সা ও বেসিস নিয়ে গঠিত। বেসিস দুইটি পাতলা শাখা বহন করে যারা এন্ডোপোডাইট ও এক্সোপোডাইট নামে পরিচিত। উদর-উপাঙ্গগুলো চিংড়ির ১৫তম থেকে ২০তম দেহখন্ডে অবস্থান করে।

এক. প্রথম উদরীয় উপাঙ্গ (First abdominal appendage)

- প্রথম উদরীয় উপাঙ্গ জোড়া চিংড়ির ১৫তম দেহখন্ডক থেকে উদ্ভূত।
- এর প্রোটোপোডাইট কক্সা ও বেসিস নিয়ে গঠিত।
- কক্সা আকারে ছোট রিং আকৃতির।

২০২৫

- বেসিস লম্বা ও গোলাকার।
- এন্ডোপোডাইট আকারে ছোট।
- অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix interna) সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।



চিত্র-১.৮: চিংড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় উদরীয়-উপাঙ্গ

দুই. দ্বিতীয় উদরীয় উপাঙ্গ (Second abdominal appendage)

- দ্বিতীয় উদরীয় উপাঙ্গ জোড়া চিংড়ির ১৬তম দেহখন্ডক থেকে উদ্ভূত।
- ছোট কক্সা ও লম্বা ও গোলাকার বেসিস নিয়ে প্রোটোপোডাইট গঠিত।
- পুরুষ চিংড়ির ২য় উদর উপাঙ্গে অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix interna) ভিতরের দিকে অ্যাপেনডিক্স ম্যাসকুলেনা (Appendix masculina) থাকে যা স্ত্রী চিংড়িতে অনুপস্থিত।

তিন-পাঁচ. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদরীয় উপাঙ্গ (Third, fourth and fifth abdominal appendage)

- তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদরীয় উপাঙ্গ জোড়া যথাক্রমে চিংড়ির ১৭, ১৮ ও ১৯তম দেহখন্ডক থেকে উদ্ভূত এবং গঠনগত দিক থেকে প্রায় একই রকম।
- প্রতিটি উপাঙ্গে কক্সা ও বেসিস নিয়ে প্রোটোপোডাইট গঠিত।
- বেসিস এক্সোপোডাইট এবং এন্ডোপোডাইট বহন করে।

২০২৫

- এন্ডোপোডাইটের ভিতরের দিকে বাঁকানো একটি অংশ থাকে যাকে অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix interna) বলে।
- সমস্ত উদর উপাঙ্গ সাঁতারে সহায়তা করে এবং স্ত্রী চিংড়িতে ডিম ধরে রাখতে সহায়তা করে।



চিত্র-১.৯: চিংড়ির উদরীয় উপাঙ্গ- ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (Abdominal Appendages)

৬ষ্ঠ উদরীয় উপাঙ্গ: পুচ্ছপদ (Uropod)

- চিংড়ির ২০তম দেহখণ্ডক থেকে উদ্ভূত সর্বশেষ জোড়া উপাঙ্গ ইউরোপোড বা পুচ্ছপদ নামে পরিচিত এবং টেলসনের (Telson) উভয় পাশে একটি করে অবস্থান করে।
- প্রোটোপোডাইট ছোট, পুরু ও প্রশস্ত ত্রিকোণাকার পাতের মত চ্যাপ্টা যা কক্সা ও বেসিস একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে।
- এক্সোপোডাইট এন্ডোপোডাইটের থেকে তুলামূলক বড় ও প্রশস্ত এবং দুইটি অসম অংশ নিয়ে গঠিত।
- এন্ডোপোডাইট এক্সোপোডাইটের চেয়ে তুলনামূলক ছোট এবং একক অংশ নিয়ে গঠিত।
- সাঁতারের সময় ইউরোপোড বা পুচ্ছপদ হালের মত কাজ করে অর্থাৎ ভারসাম্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।



চিত্র-১.১০: চিংড়ির ৬ষ্ঠ উদরীয় উপাঙ্গ- পুচ্ছপদ (Uropod)

চিংড়ির বিভিন্ন উপাঙ্গের কাজঃ

অঙ্গ	উপাঙ্গ	উপাঙ্গের কাজ
মাথা	অ্যান্টিনিউল	স্বাদ ও স্পর্শ
	অ্যান্টেনা পুঞ্জাক্ষি	দেহের ভারসাম্যতা, স্বাদ ও স্পর্শ তীব্র ও স্তিমিত বা অস্পষ্ট আলোতে দেখতে সহায়তা করে।
	রোস্ট্রাম	আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।
	ম্যান্ডিবল ম্যাক্সিলুলা ম্যাক্সিলা	খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য চিবানো ও খাদ্য নড়াচড়ার কাজে সাহায্য করে।
বুক	প্রথম ম্যাক্সিলিপেড দ্বিতীয় ম্যাক্সিলিপেড তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড	স্পর্শ, স্বাদ, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য টুকরা করা, মুখ থেকে বর্জিত খাদ্যাংশ দূরীকরণ ও শ্বাসকার্যে সহায়তা করা।
	প্রথম চলন পদ দ্বিতীয় চলন পদ তৃতীয় চলন পদ চতুর্থ চলন পদ পঞ্চম চলন পদ	খাদ্য আঁকড়িয়ে ধরা এবং আত্মরক্ষা ও হাঁটার কাজ করে। ফুলকাতে পানি সরবরাহ ও শ্বসন কাজে সহায়তা করে।
উদর	প্রথম সন্তরণ পদ দ্বিতীয় সন্তরণ পদ	শুক্রানু স্থানান্তরের কাজ করে। সন্তরণ কাজে সহায়তা করে।

২০২৫

	তৃতীয় সন্তরণ পদ চতুর্থ সন্তরণ পদ পঞ্চম সন্তরণ পদ	পানি সংবহনে সহায়তা করে সন্তরণে কাজ করে ডিম রক্ষার কাজ করে
	পুচ্ছ পদ	সন্তরণ কাজে সহায়তা করে। প্রয়োজনে পিছনের দিকে চলে যেতে সহায়তা করে।

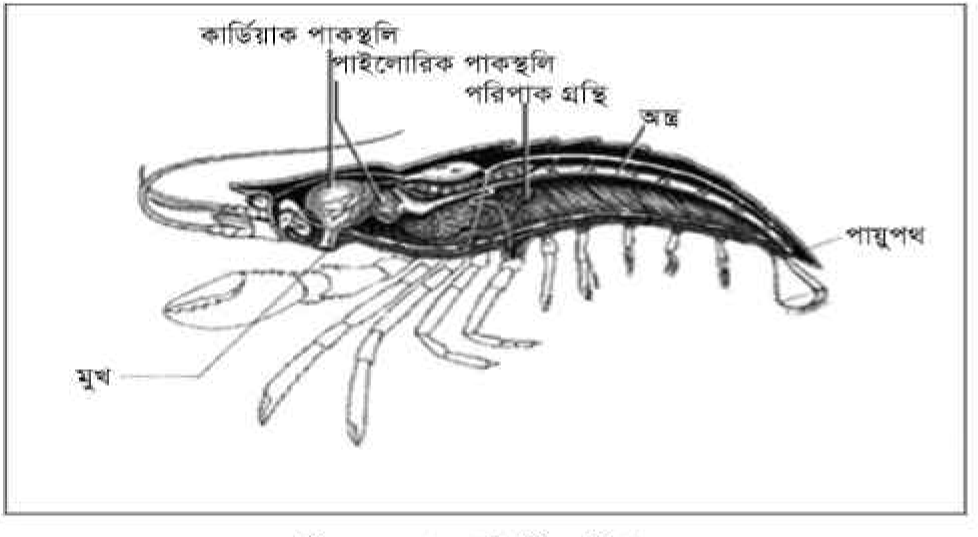
১.১.৩ গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গাসমূহ

চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান প্রধানত: পুষ্টিতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র ও জননতন্ত্র নিয়ে গঠিত।

১.১.৩.১ গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিংড়ির পরিপাক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে তাদের সমষ্টিকে চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র বলা হয়। চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র সাধারণত পরিপাকনালী ও হেপাটোপ্যানক্রিয়াস নামক পরিপাক গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। পরিপাকনালী মুখগহবর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিপাকনালী প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা-

ক) অগ্রপরিপাকনালী (Forgut): মুখ, মুখগহ্বর, অন্ননালী ও পাকস্থলী নিয়ে অগ্রপরিপাকনালী গঠিত। মস্তক খন্ডের নিচের দিকে মুখের অবস্থান। এর অগ্রভাগে উর্ধ্বোষ্ঠ বা লেব্রাম এবং পশ্চাৎ দিকে নিম্নোষ্ঠ বা লেবিয়াম অবস্থিত। এছাড়া ম্যান্ডিবলের দুই পাশে দুটি ইনসিসর প্রসেস থাকে। নিম্নোষ্ঠের উভয় পাশে দুইটি প্রশস্ত অংশ থাকে যা প্যারাগনাথা (paragnatha) নামে পরিচিত।



চিত্র-১.১১: গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র

মুখ গহ্বর (Buccal cavity): মুখের পিছনেই মুখ গহ্বর অবস্থিত। মুখ গহ্বরের দুই পাশে ম্যান্ডিবলে মোলার প্রসেসর থাকে, এর সাহায্যে খাদ্যবস্তু মুখ গহ্বরে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়।

অন্ননালী (Oesophagus): এটা পেশিযুক্ত মোটা নালীবিশেষ যা মুখ গহ্বরের পিছনে থেকে শুরু হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করেছে। এই প্রবেশ পথে কপাটিকা থাকে। এর ফলে খাদ্যবস্তু একবার পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে তা আর অন্ননালীতে ফিরে আসতে পারে না।

পাকস্থলী (Stomach): পরিপাকনালীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের থলিটির নাম পাকস্থলী। পাকস্থলী চিংড়ির শিরোবক্ষের বেশির ভাগ স্থান দখল করে থাকে। পাকস্থলী প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-

i) কার্ডিয়াক পাকস্থলী ও

ii) পাইলোরিক পাকস্থলী

খ) মধ্য পরিপাকনালী (Mid gut): পাইলোরিক পাকস্থলীর পরবর্তী ভাগ থেকে মধ্য পরিপাকনালী শুরু। এই নালীটি লম্বা, সরু, সোজা ও নলাকৃতির এবং দেহের মাঝামাঝি স্থান বরাবর পিছনের দিকে ষষ্ঠ উদর খন্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য পরিপাকনালীর ভেতরের দেয়াল এপিথেলিয়াম স্তর দ্বারা আবৃত এবং পিছনের অংশ লম্বালম্বি অসংখ্য ভাঁজ দ্বারা সজ্জিত থাকে।

গ) পশ্চাৎ পরিপাকনালী (Hind gut):

মধ্য পরিপাকনালীর পরবর্তী অংশকে পশ্চাৎ পরিপাকনালী বলে এবং এই নালী পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। পরিপাকনালীর এই অংশ স্ফীত হয়ে পুরু মাংসপেশী দ্বারা গঠিত ছোট থলিতে পরিণত হয়েছে। এই থলিকে মলাশয় বা রেকটাম (Rectum) বলে। এই মলাশয় সর্বশেষ উদর উপাঙ্গ দুটির মাঝ বরাবর একটি ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। এই পথকে পায়ুপথ(Anus) বলে। পায়ুপথে মল দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

যকৃত-অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি (Hepatopancreas)

শিরোবক্ষের গহ্বরে কমলা রং এর এক প্রকার অঙ্গ দেখা যায়, একে যকৃত-অগ্ন্যাশয় বলে। এই অঙ্গটি কার্ডিয়াক পাকস্থলীর শেষ অংশ, পার্শ্বদেশ, পাইলোরিক পাকস্থলী ও মধ্য অন্ননালীর কিছু অংশকে ঢেকে রাখে। হেপাটোপ্যানক্রিয়াস প্রধানত পাচক রস নিঃসরণ, খাদ্যরস শোষন এবং গ্লাইকোজেন ও ফ্যাট প্রভৃতি সঞ্চয় করে রাখে। এই গ্রন্থি যকৃত ও অগ্ন্যাশয় উভয়ের কাজ করে বলে একে হেপাটোপ্যানক্রিয়াস বা যকৃত -অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি বলে।

১.১.৪ চিংড়ির খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া

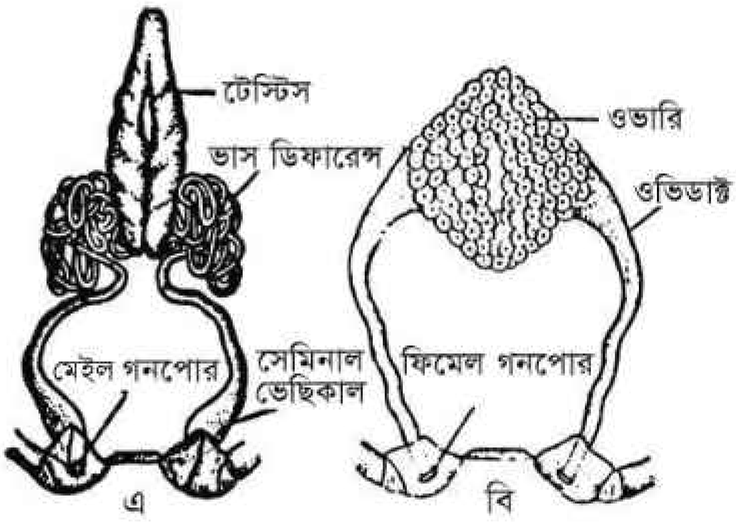
চিংড়ি সাধারণত প্রথম ও দ্বিতীয় চলনপদের সাহায্যে খাদ্য ধরে এবং মুখছিদ্রের সম্মুখে নিয়ে আসে। এই ক্রিয়ায় তৃতীয় ম্যাক্সিলিপেড সাহায্য করে থাকে। চিংড়ি ম্যান্ডিবলের সাহায্যে খাদ্যবস্তু টুকরা টুকরা করে এবং পরে মোলার প্রসেস দ্বারা খাদ্যবস্তু চূর্ন-বিচূর্ণ করে অন্ননালী ও কার্ডিয়াক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

অন্ননালী ও কার্ডিয়াক পাকস্থলী পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্য কার্ডিয়াক পাকস্থলীতে আসে। অতঃপর চূর্ন-বিচূর্ণ খাদ্য কণাগুলো কার্ডিয়াক পাকস্থলী থেকে পাইলোরিক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। হেপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পাচকরস যকৃত-অগ্ন্যাশয় নালী দিয়ে পাইলোরিক পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সেখানে খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

পাইলোরিক পাকস্থলীর ফিল্টার প্লেটের সাহায্যে পরিশ্রুত তরল খাদ্য যকৃত-অগ্ন্যাশয় নালীর ছিদ্রপথ দিয়ে যকৃত-অগ্ন্যাশয়ে প্রবেশ করে এবং এখানে খাদ্য শোষিত হয়। যকৃত- অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি হজম এবং খাদ্যের সার অংশ শোষণের কাজ করে থাকে। পাইলোরিক পাকস্থলীর অবশিষ্ট খাদ্যরস ও কঠিন অপাচ্য খাদ্য মধ্য অন্ননালীতে প্রবেশ করে। মধ্য অন্ননালীতে অন্ত্রের তরল খাদ্যের মূলরস শোষিত হয় এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে সাময়িকভাবে মলাশয়ে জমা থাকে এবং পরে পায়ুপথ দিয়ে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

১.২ গলদা চিংড়ির প্রজননতন্ত্র (Reproductive system)

চিংড়ি একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন জননের (Sexual reproduction) জন্য প্রাণিদেহে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ থাকে। এই অঙ্গ থেকে জননকোষ অর্থাৎ শুক্রানু অথবা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এদের প্রাথমিক জনন অঙ্গ বা গোনাড (Gonad) বলা হয়। জননকোষ প্রাথমিক জনন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয়ে কয়েকটি নালীর মধ্য দিয়ে পরিশেষে ছিদ্র পথে বাইরে চলে আসে। এই নালীগুলোকে জনন নালী (Genital duct) ও ছিদ্রগুলো জনন ছিদ্র (Gonopores) বলা হয়। এগুলোকে গৌণ জনন অঙ্গ (Secondary reproductive organ) বলা হয়। এই প্রাথমিক ও গৌণ জনন অঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট জননতন্ত্রের সাহায্যে চিংড়ি জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এই অঙ্গতন্ত্রকে জননতন্ত্র (Reproductive system) বলা হয়।



চিত্র-১.১২: পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ির জনন অঙ্গ

১.২.১ পুংজননতন্ত্র (Male reproductive system)

চিংড়ির পুংজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গাগুলো দ্বারা গঠিতঃ

ক) শুক্রাশয় (Testis): চিংড়ির দেহে একজোড়া নরম ও লম্বা শুক্রাশয় থাকে। শুক্রাশয় হৃদযন্ত্রের নিচে এবং যকৃত-অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ঠিক উপরে অবস্থান করে। শুক্রাশয়ের অগ্রভাগগুলো পরস্পর যুক্ত ও রেচনথলি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঙ্গে অসংখ্য লবিউলস (Lobules) দেখা যায়। এ লবিউলের ভিতরে স্পার্মাটোসাইটস থেকে একটি করে স্পার্মাটোজোয়া (Spermatozoa) তৈরি হয়। একটি পরিপক্ক শুক্রকীট (Sperm) দেখতে অনেকটা খোলা ছাতার মতো।

খ) শুক্রনালী (Vasa deferentia): চিংড়িতে একজোড়া শুক্রনালী দেখা যায়। প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাদপ্রান্ত থেকে একটি করে নালী বের হয়, একে শুক্রনালী বলে। শুক্রনালী প্রথমাংশ একসাথে কুন্ডলাকারে জড়িয়ে থাকে এবং এই অংশে যকৃত-অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির উপরে অবস্থান করে এবং পরবর্তী অংশ বক্ষ প্রাচীরের মাধ্যমেই শুক্রকীট শুক্রাশয় থেকে পুংজনন ছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়।

গ) শুক্রথলি (Seminal vesicles): প্রতিটি শুক্রনালী পঞ্চমপদ উপাঙ্গের গোড়ায় এসে কিঞ্চিৎ স্ফীত হয়ে ক্লাব আকৃতির (Club shaped) থলিতে পরিনত হয়, এই থলিকে শুক্রথলি বলে। শুক্রথলিতে শুক্রকীটগুলো একত্রে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এগুলোকে স্পার্মাটোফোর (Spermatophore) বলে।

(ঘ) পুংজনন ছিদ্র (Male genital aperture): শুক্রথলি শুক্রনালীর মাধ্যমে পঞ্চম চলন উপাঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত একটি ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্র পথকে পুংজনন ছিদ্র বলা হয়। পুংজনন ছিদ্রটি একটি ঢাকনা দ্বারা আবৃত থাকে। এই ছিদ্রপথে স্পার্মাটোফোর দেহের বাইরে চলে আসে।

১.২.২ স্ত্রী জননতন্ত্র (Female reproductive system)

চিংড়ির স্ত্রী জননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী ও স্ত্রীজনন ছিদ্র এর সমন্বয়ে গঠিত।

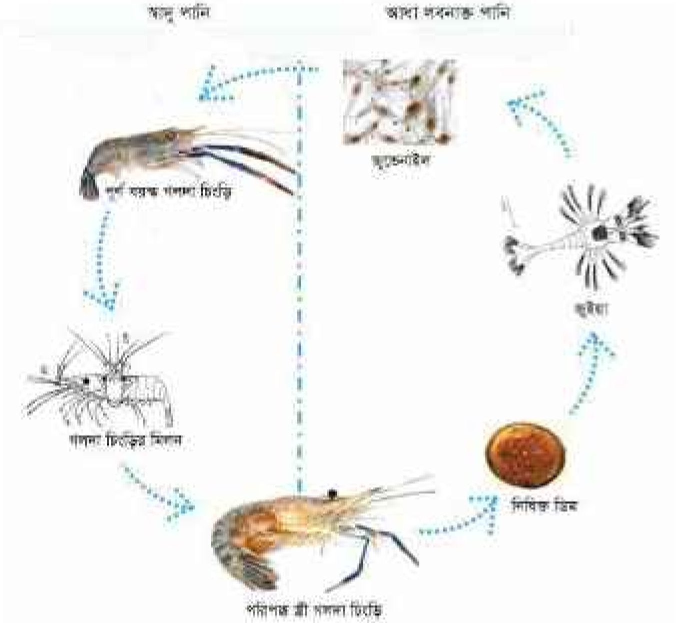
ক) ডিম্বাশয় (Ovaries): চিংড়ির প্রধান জনন অঙ্গ ডিম্বাশয় হৃৎপিন্ডের নিচে ও যকৃত-অগ্ন্যাশয়ের পিছনে উপরের দিকে অবস্থান করে এবং সম্মুখের দিকে রেনাল স্যাক বা রেচনথলি ও পশ্চাৎদিকে উদর খন্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। ডিম্বাশয় দুইটি সামনে ও পিছনের দিকে যুক্ত থাকে এবং মধ্যভাবে পরস্পর পৃথক হয়ে একটি ছোট ফাঁক সৃষ্টি করে। ডিম্বাশয়ের ভিতরেই ডিম্বাণুর সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণুগুলো গোলাকার বিশেষ। পরিপক্ক ডিমে সাইটোপ্লাজমের কুসুমদানা ও মাঝখানে বড় নিউক্লিয়াস থাকে।

খ) ডিম্বানালী (Oviduct): পাতলা প্রাচীর দ্বারা ডিম্বনালী আবৃত থাকে। ডিম্বনালীর উৎপত্তি ডিম্বাশয়ের মধ্যভাগের বাহির অংশ থেকে হয়। এই নালীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল স্ফীত হয় কিন্তু ক্রমশ সরু হয়ে বক্ষ প্রাচীর বরাবর অঙ্কীয় দেশে তৃতীয় চলনপদের দিকে অগ্রসর হয়ে কক্সার গোড়ায় অবস্থিত স্ত্রী জনন ছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়। ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন ডিম্বানু ডিম্বনালীর মাধ্যেমে স্ত্রীজনন ছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়।

গ) স্ত্রীজনন ছিদ্র (Female genital apertures): ডিম্বনালী চিংড়ির তৃতীয় চলনপদের গোড়ার ভেতরের দিকে উঁচু স্থানে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্রকে স্ত্রীজনন ছিদ্র বলা হয়। স্ত্রীজনন ছিদ্র দিয়ে ডিম্বানু দেহের বাইরে নির্গত হয়।

১.৩ গলদা চিংড়ির জীবন বৃত্তান্ত

গলদা চিংড়ির জীবনচক্রে ৪টি প্রধান অবস্থা রয়েছে। যেমন-ডিম, লার্ভা, পোস্ট লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি।



চিত্র-১.১৩: গলদা চিংড়ির জীবন চক্র

ডিম: স্ত্রী গলদা চিংড়ির ডিমের রং প্রথমে কমলা থাকে এবং তা পর্যায়ক্রমে ১৮-২১ দিনে কালচে ধূসর রং ধারণ করে। ২৮° সে তাপমাত্রায় ডিম ফুটতে প্রায় ১৮-২১ দিন সময় লাগে। গলদা চিংড়ির ডিম সর্বদা রাতের বেলায় ফোটে। ডিম ফোটার পর স্ত্রী চিংড়ি সন্তরণ পদ নেড়ে লার্ভাগুলোকে পানিতে ছড়িয়ে দেয়। ডিম থেকে লার্ভা বের হতে ২ রাত পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

লার্ভা: লার্ভা দেখতে অনেকটা পোকার মত। এরা লেজ উপরে এবং মাথা নিচে রেখে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় এরা আধা লবণাক্ত (১২-১৫ পিপিটি) পানিতে অবস্থান করে এবং প্রাণীকণা খেতে শুরু করে। লার্ভা অবস্থা শেষ হতে ৩০-৪০ দিন সময় লাগতে পারে।

পোস্ট লার্ভা: পোস্ট-লার্ভায় এদেরকে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির মতো দেখায় এবং নদী, খাল বা বিলের পাড়ের কাছে তলদেশে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে। এ অবস্থায় এরা অপেক্ষাকৃত বড় খাদ্য টুকরা (উদ্ভিদ ও প্রাণিজ) খেতে পারে।

পোস্ট-লার্ভা অবস্থায় আসার ৭-১৫ দিনের মধ্যে (১.৫ সেমি.) এরা মিঠাপানির দিকে চলে আসতে শুরু করে। এ অবস্থায় এরা নদীর স্রোতের বিপরীতে নদীর পাড় বরাবর অগ্রসর হতে থাকে। প্রায় ৩০ দিনের মধ্যে পোস্ট-লার্ভা কিশোর চিংড়িতে পরিণত হয়। ২-৩ মাস বয়সে (৬-৭ সেমি) এরা তরুণ এবং আরও ৩-৪ মাস পর এরা প্রাপ্ত বয়স্ক চিংড়িতে পরিণত হয়।

১.৪ চিংড়ির বৃদ্ধি ও খোলসছাড়া (Growth and Moulting)

চিংড়ির দেহ খোলস দ্বারা আবৃত থাকে। এই খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমেই চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে। চিংড়ির বয়োঃবৃদ্ধির সাথে সাথে পুরাতন খোলস খসে পড়ে এবং নতুন খোলস সৃষ্টি হয়। চিংড়ির এই খোলস বদলানোর প্রক্রিয়াকে একডাইসিস (Ecdysis) বলে। খোলস বদলানোর প্রক্রিয়া সাধারণত রাতেই ঘটে। ছোট অবস্থায় নতুন খোলস শক্ত হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে এবং বড় অবস্থায় শক্ত হতে ১-২ দিন সময় লাগে। খোলস বদলানোর সময় চিংড়ি শারীরিকভাবে খুব দুর্বল থাকে। খাদ্য, আবহাওয়া, পরিবেশ, পানির গুণাগুণ, তাপমাত্রা, রোগবালাই, প্রভৃতির ওপর চিংড়ির খোলস বদলানো নির্ভরশীল। লার্ভা অবস্থায় এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে চিংড়ি এগারো বার খোলস পরিবর্তন করে থাকে। গলদা চিংড়ি জুভেনাইল অবস্থায় ৫-১০ দিন অন্তর একবার এবং বড় অবস্থায় ২০-৪০ দিনে একবার খোলস ছাড়ে। গলদা চিংড়ির আয়ুষ্কাল সাধারণত ৩-৪ বছর হয়ে থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ির পার্থক্য

- স্ত্রী গলদার চেয়ে পুরুষ গলদা চিংড়ি বেশি বাড়ে, তাই একই বয়সের পুরুষ চিংড়ি স্ত্রী চিংড়ির চেয়ে আকারে খানিকটা বড় হয়।
- পুরুষ চিংড়ির শিরোবক্ষ আকারে মোটা এবং বড় হয় আর উদরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত সরু দেখায়। অপরদিকে স্ত্রী চিংড়ির মাথা ও দ্বিতীয় বাহু অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে এবং উদরাঞ্চলের তলারদিকে ডিমধারণের জন্য নিম্নোদর অপেক্ষাকৃত চওড়া হয়।
- পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় চলন পদ লম্বা, মোটা, রঙিন, কন্টকযুক্ত এবং চিমটা বিশিষ্ট। এই দ্বিতীয় বাহুর দ্বারা পুরুষ স্ত্রী চিংড়িকে সঙ্গমকালে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গানে আবদ্ধ রাখে।
- পুরুষ চিংড়ির প্রথম উদর খন্ডের বুকের দিকে মাঝখানে একটা ছোট কাঁটার মত দেখা যায় যা স্ত্রী চিংড়ির থাকে না।
- পুরুষ গলদার ক্ষেত্রে পেটাসমা বা স্ত্রী গলদার ক্ষেত্রে থেলিকাম অনুপস্থিত। এ কারনে গলদা চিংড়িকে "উন্মুক্ত থেলিকাম" চিংড়ি বলা হয়।
- পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় সন্তরণ পদের ভিতরের দিকের পত্রের গোড়ায় লোমের মত অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা থাকে। জুভেনাইল অবস্থায় এই অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা দেখেই পুরুষ চিংড়ি শনাক্ত করা যায়। স্ত্রী চিংড়ির অ্যাপেন্ডিক্স ম্যাসকুলিনা থাকে না।
- স্ত্রী চিংড়ির পিঠের খোলসগুলো পুরুষ চিংড়ি অপেক্ষা বড় হয় এবং উভয় দিকে নেমে এসে ডিমগুলো ঢেকে রাখতে সাহায্য করে।

- পুরুষ চিংড়ির জনন ছিদ্র পঞ্চম চলনপদের গোড়ায়, আর স্ত্রী চিংড়ির জনন ছিদ্র তৃতীয় চলনপদের গোড়ায় অবস্থিত। পরিপক্ব স্ত্রী চিংড়ির মাথার দিকে ক্যারাপেসের নিচে ও পাশে গোলাপি/কমলা রং এর আভা দেখে ওভারির অভ্যন্তরে ডিমের উপস্থিতি বুঝা যায়। কিন্তু পুরুষ চিংড়ির ওভারি থাকে না।
- পুরুষ গলদা চিংড়ির ৫ম জোড়া চলনপদের দুইটি গোড়ায় মধ্যবর্তী দুরত্ব স্ত্রী গলদা অপেক্ষা সরু হয়ে থাকে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ - ১

তোমার এলাকার আশে পাশের পুকুর / ঘের থেকে গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করে তা পর্যবেক্ষণ কর এবং নিম্নের ছকে তোমার মতামত দাও।

চিংড়ি সংগ্রহের স্থান	
চিংড়ির গায়ের বর্ণ	
উদর অঞ্চলের বর্ণ	
দ্বিতীয় চলন পদ কেমন	
গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি বা মাছ চাষ করা হয় কিনা?	
গলদা চিংড়ির সাথে চাষকৃত মাছের প্রজাতির নাম লিখ?	১. ২. ৩. ৪.
স্ত্রী ও পুরুষ গলদার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ কর	১. ২. ৩. ৪.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ-১

গলদা চিংড়ির বক্ষ-উপাঙ্গ সমূহের (Thoracic appendage) নাম ও কাজ লেখ।

ক্রম.	উপাঙ্গের নাম	কাজ

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ-৩

গলদা চিংড়ির উদর-উপাঙ্গ সমূহের (Abdominal appendage) নাম ও কাজ লেখ।

ক্রম.	উপাঙ্গের নাম	কাজ

জব ১: গলদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করা
- যথাযথ ভাবে গলদা চিংড়ির বাহ্যিক অংগসমূহ শনাক্ত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	২টি
০৪	গলদা চিংড়ি	৭-১০ গ্রাম ওজনের	২টি
০৫	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৬	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৭	সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ	দেশি	১টি

(গ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা চিংড়ি খামার থেকে মাঝারি/বড় আকারের তাজা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. সংগৃহীত চিংড়ি পানি ভর্তি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো।

৩. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- চাষির নাম, পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানি ও নমুনা সংগ্রহের তারিখ লিপিবদ্ধ করো।

৪. এবার চিংড়ি বালতি থেকে তুলে ট্রেতে রাখো। তারপর ফরসেপ দিয়ে চিংড়ির শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন- শিরোবক্ষ, উদর, বিভিন্ন উপাঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখো এবং ছবিতে চিহ্নিত অংশগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৫. এবার ট্রেতে রক্ষিত চিংড়ির ছবি ব্যবহারিক খাতায় পেন্সিলের সাহায্যে আঁকো এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

৬. অনুশীলনকৃত কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- চিংড়িগুলো যাতে সতেজ (পঁচা না হয়) থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- মানসম্পন্ন ডিসেকটিং বক্সসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের নমুনা সংগ্রহ করা
- যথাযথ ভাবে চিংড়ির বাহ্যিক অঙ্গসমূহ শনাক্ত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	২টি
০৪	গলদা চিংড়ি	৭-১০ গ্রাম ওজনের	২টি
০৫	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৬	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৭	সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ	দেশি	১টি

(গ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা চিংড়ি খামার থেকে মাঝারি ও বড় আকারের তাজা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. সংগৃহীত চিংড়ি পানি ভর্তি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো।

৩. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন- চাষির নাম, পুকুরের অবস্থান, আয়তন, পানি ও নমুনা সংগ্রহের তারিখ লিপিবদ্ধ করো।

৪. এবার চিংড়ি বালতি থেকে তুলে ট্রেতে রাখো। তারপর কাঁচি, ফরসেপ, নিডল ইত্যাদি দিয়ে কেটে চিংড়ির শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন- পরিপাকতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখো এবং ছবিতে চিহ্নিত অংশগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৫. এবার ব্যবহারিক খাতায় পেন্সিলের সাহায্যে গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গের ছবি আঁক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো। তোমার চিহ্নিত ছবির সাথে ছবিতে চিহ্নিত অংশগুলো মিলিয়ে দেখো।

৬. অনুশীলনকৃত কার্যপদ্ধতি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- চিংড়িগুলো যাতে সতেজ (পঁচা না হয়) থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- মানসম্পন্ন ডিসেকটিং বক্সসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/ আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করা
- যথাযথ ভাবে চিংড়ির পরিপাক অংগসমূহ শনাক্ত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	২টি
০৪	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৫	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৬	সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ	দেশি	১টি
০৭	গলদা চিংড়ি	৭-১০ গ্রাম ওজনের	২টি

(গ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন, চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করো।

৩. নমুনা চিংড়ি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো।

৪. বালতি থেকে এবার চিংড়ি তুলে ট্রেতে রাখো।

৫. চিংড়িটিকে এবার পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ট্রেতে আটকিয়ে রাখো।

৬. আঁতশ কাঁচের সাহায্যে চিংড়ির মুখ ও পায়ু পর্যবেক্ষণ করো।

৭. খুব সাবধানে শিরোবক্ষ ও উদর উপাঙ্গগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে সরিয়ে ফেলো।

৮. কাঁচি দিয়ে পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর কাটো।

৯. ফরসেপ দিয়ে সাবধানে নিচের পেশি সরিয়ে ফেলো।

১০. এবার হৃৎপিন্ড ও যকৃত কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললে যকৃত-অগ্ন্যাশয়গ্রন্থিটি দেখা যাবে তা বের করো।

১১. ফরসেপ ও স্কালপেল দিয়ে যকৃত-অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি সরিয়ে নিয়ে গলদা চিংড়ির পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

১২. অগ্র পরিপাকনালী, মধ্য পরিপাকনালী ও পশ্চাৎ পরিপাকনালী ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

১৩. পেন্সিল দিয়ে পরিপাকতন্ত্র এর চিত্র খাতায় অঙ্কন ও বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।

১৪. অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- চিংড়িগুলো যাতে সতেজ (পঁচা না হয়) থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- মানসম্পন্ন ডিসেকটিং বক্সসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: গলদা চিংড়ির প্রজননতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- উপযুক্ত আকারের গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করা
- যথাযথ ভাবে গলদা চিংড়ির প্রজনন অঙ্গসমূহ শনাক্ত করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	স্যানিটাইজার	মানসম্পন্ন	১ বোতল
০৪	অ্যাপ্রন	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ডিসেক্টিং বক্স	মাঝারি মানের	১টি
০২	ওয়াক্স ট্রে	মাঝারি আকারের	১টি
০৩	স্পেসিমেন জার	৮-১২ ইঞ্চি আকারের	৪টি
০৪	গলদা চিংড়ি	৭-১০ গ্রাম ওজনের	১০টি
০৫	টিস্যু পেপার	সাধারণ মানের	১টি
০৬	ইথানল/ফরমালিন	ল্যাবরেটরি গ্রেড	১ লিটার
০৭	সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ	দেশি	১টি

(গ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার, পুকুর বা খামার থেকে স্ত্রী ও পুরুষ গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. নমুনা চিংড়ি সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য যেমন চাষির নাম, খামারের অবস্থান, আয়তন, নমুনা সংগ্রহের তারিখ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করো।

৩. নমুনা চিংড়ি বালতিতে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসো।

৪. বালতি থেকে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি তুলে ভিন্ন ভিন্ন ট্রেতে রাখো।

৫. চিংড়িকে এবার পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে রেখে আলপিন দিয়ে ভালোভাবে ট্রেতে আটকিয়ে ফেলো।

৬. এবার চিংড়ির পৃষ্ঠপার্শ্ব বরাবর কাঁচি ও ফরসেপ দিয়ে টারগাম ও পেশি সরিয়ে ফেলো।

৭. পেশি সরানোর পর সাবধানে হৃৎপিন্ডটি সরিয়ে ফেললে যকৃত-অগ্ন্যাশয় দেখা যাবে।

৮. গলদা চিংড়ির পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো পর্যবেক্ষণ করো।

৯. পেন্সিল দিয়ে প্রজননতন্ত্রের ছবি আঁকো ও জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো।

১০.অনুশীলন পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- চিংড়িগুলো যাতে সতেজ (পঁচা না হয়) থাকে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- মানসম্পন্ন ডিসেকটিং বক্সসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ির অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গ পর্যবেক্ষণ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-১

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মিঠা পানির গলদা চিংড়ির ডিম পরিস্ফুটন থেকে পোষ্ট লার্ভা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ কোথায় সম্পন্ন হয়?

২। চিংড়ির শিরোবক্ষ পৃষ্ঠদেশের আবরণ কি নামে পরিচিত?

৩। চিংড়ি কিসের দ্বারা পুঞ্জাক্ষীকে চারিদিকে ঘুরাতে পারে?

৪। চিংড়ির দেহে সর্বমোট কয় জোড়া উপাঙ্গ রয়েছে?

৫। জুভেনাইল অবস্থায় চিংড়ি কতদিন অন্তর একবার খোলস বদলায়?

৬। সাঁতার কাটার সময় কোন অঙ্গের সাহায্যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে?

৭। চিংড়ির কোন চলনপদকে আদর্শ চলনপদ বলা হয়?

৮। কোন উপাঙ্গকে চিংড়ির আদর্শ সন্তরণ উপাঙ্গ বলা হয়?

৯। কোন উপাঙ্গের সাহায্যে চিংড়ি পিছনের দিকে দ্রুত চলে যেতে পারে?

১০। গলদা চিংড়ির ডিম ফুটার জন্য পানির লবণাক্ততা কত হওয়া দরকার?

১১। লার্ভা অবস্থায় গলদা চিংড়ি কতবার খোলস পাল্টায়?

১২। লার্ভা থেকে পোষ্ট লার্ভা অবস্থায় পৌঁছাতে গলদা চিংড়ির কতদিন সময় লাগে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ চিংড়ির শিরোপাঙ্গাগুলোর নাম লেখ।

২। একডাইসিস বলতে কি বোঝ লেখ।

৩। গলদা চিংড়ির শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য লেখ।

৪। গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ও খোলস ছাড়া সম্পর্কে লেখ।

৫। পুরুষ ও স্ত্রী গলদা চিংড়ির মধ্যে পার্থক্য লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১.গলদা চিংড়ির বিভিন্ন উপাঙ্গের কার্যাবলী বর্ণনা করো।

২.গলদা চিংড়ির খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

৩.গলদা চিংড়ির জীবনচক্র বর্ণনা করো।

৪. গলদা চিংড়ির স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের বর্ণনা দাও।

২০২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

গলদা চিংড়ির খামার ব্যবস্থাপনা

Farm Management of Golda Prawn



প্রাকৃতিক পরিবেশে গলদা চিংড়ি স্বাদুপানি এবং ঈষৎ লবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্বাদুপানির দ্রুত বর্ধনশীল চিংড়ির মধ্যে গলদা চিংড়ি অতি পরিচিত। তবে নদীর যে অংশে জোয়ার-ভাটার তারতম্য বেশি সেখানে এরা অবস্থান করতে বেশি পছন্দ করে। গলদা চিংড়ি স্বাদু পানি ও হালকা লবণযুক্ত পানিতে ভালোভাবে চাষ করা যায়। আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করে উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- গলদা চিংড়ির খামারের স্থান নির্বাচন করতে পারব
- গলদা চিংড়ি খামারের অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারব
- গলদা চিংড়ি চাষের পুকুর প্রস্তুত করতে পারব
- গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ করতে পারব
- পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করতে পারব।

২০২৫

২। গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে গলদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে দেশে কমপক্ষে ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব।

গলদা চিংড়ি উৎপাদন ও সম্প্রসারণে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধান করা গেলে দেশের সার্বিক গলদা চিংড়ির উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। চিংড়ি খামারের আয়তন ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪,০০০ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে এর আয়তন দাঁড়িয়েছে ১৪০,০০০ হেক্টরে।

দেশে চিংড়ির শতকরা প্রায় ২৩% উৎপাদন গলদা চিংড়ি থেকে পাওয়া যায়। এটি একটি বিকাশমান কৃষিভিত্তিক শিল্প। গলদা চিংড়ির সুবিধাগুলো হচ্ছে-

- চাষ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ,
- গলদা চিংড়ি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়,
- প্রায় সকল আকারের বাজারজাত উপযোগী। তবে ১২-৩০ গ্রেডের চিংড়িতে লাভ বেশী,
- উচ্চ বাজার মূল্য,
- স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ এবং ৬-৮ মাসে সম্পূর্ণ চিংড়ি বাজারজাত করা যায়,
- অগভীর পুকুর/ঘেরে চাষাবাদ সম্ভব (১-১.৫ মিটার পানির গভীরতা),
- মৌসুমী পুকুরেও গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়,
- গলদার সাথে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ একত্রে করা যায়,
- উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় সারাবছর পোনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা,
- উপকূলীয় জেলাগুলোর স্থায়ী জলাবদ্ধতাকে কাজে লাগানো যায়,
- ধানক্ষেতেও গলদা চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব,
- অমেরুদন্ডী কাঁটাবিহীন এবং খাদ্য হিসেবে ঝামেলামুক্ত বলে সকলের কাছে প্রিয় এবং
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গলদা চিংড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

২.১ গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশে স্বাদুপানিতে যে সকল প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায় তার মধ্যে গলদা চিংড়ির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। বাংলাদেশে প্রায় ২৭ প্রজাতির স্বাদু পানির চিংড়ি পাওয়া যায় এর মধ্যে গলদার আকার-আকৃতি সর্ববৃহৎ। প্রাকৃতিকভাবে গলদা চিংড়ির পিএল, জুভেনাইল এবং পরিপক্ক চিংড়ি সাধারনত দেশের

দক্ষিনাঞ্চলে আধালবণাক্ত পানিতে পাওয়া যায়। গলদা আধালবণাক্ত পানিতে ডিম ছাড়ে এবং লার্ভা এ এলাকায় প্রতিপালিত হয়। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক নিয়মেই চিংড়ি পোনা খাল, বিল, প্লাবনভূমিতে বা প্লাবিত ধানক্ষেতে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বড় হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে দেশের নদ-নদীতে গলদা চিংড়ি বা গলদা চিংড়ির পোনা কমে যাচ্ছে।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গলদা চিংড়ির চাহিদা ও মূল্য ক্রমাগতভবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । গলদা চিংড়ি বাজারজাতকরণে প্রায় ৮-৯ মাস সময় লাগে । দেশে গলদা চিংড়ির বর্তমান গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৪০০-৭০০ কেজি। এ উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম।

২.২ গলদা চিংড়ি ও ছটকা চিংড়ির দৈহিক বৈশিষ্ট্য

গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র মিঠাপানিতে এই চিংড়ি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোসহ মেঘনা বিধৌত জেলাসমূহ যেমন-কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলার নদ-নদী, খাল-বিলে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার হাওর এলাকায় গলদা চিংড়ির বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় ।



চিত্র-২.১: গলদা চিংড়ি (*Macrobrachium rosenbergii*)

দৈহিক বৈশিষ্ট্যঃ

- গলদা চিংড়ি দেখতে সাধারনত হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে,
- এই চিংড়ির ক্যারাপেসের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি লম্বা ও বাঁকানো দাগ থাকে,
- রোস্ট্রামের উপরিভাগে ১১-১৪টি এবং নিচের অংশে ৮-১৪ টি খাঁজ বা দাঁত থাকে,
- অন্যান্য চিংড়ির তুলনায় গলদা চিংড়ির শিরোবক্ষ (Cephalothorax) অংশ বেশ বড়,
- এই চিংড়ির দ্বিতীয় চলনপদ তুলনামূলকভাবে বড় এবং নীল ও কিছুটা কালচে রঙের হয়ে থাকে, এবং
- গলদা চিংড়ির উদরের প্লিউরা প্রথম ও তৃতীয় প্লিউরাকে আংশিকভাবে আবৃত করে রাখে।

ছটকা চিংড়ি (*Macrobracium malcomsonii*)

প্রাপ্তিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ময়মনসিংহ, দাউদকান্দি, চাঁদপুর, নরসিংদী, রংপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, ফেনী ও চট্টগ্রামে এই চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।



চিত্র-২.২: ছটকা চিংড়ি (*Macrobrachium malcomsonii*)

দৈহিক বৈশিষ্ট্যঃ

- এই চিংড়ির পৃষ্ঠদেশ ও তলদেশ হালকা নীল কিংবা সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে,
- দেহে বাদামি কিংবা কমলা বর্ণের ফ্যাকাশে হালকা টান টান দাগ থাকে,
- রোস্ট্রামের গোড়া উত্তল, এবং
- রোস্ট্রামের উপরিভাগে ৯-১৪টি ও নিচের দিকে ৫-৯ টি দাঁত থাকে।

২০২৫

২.৩ গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতির ধরণ

২.৩.১ বিভিন্ন ধরণের চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। চাষ ব্যবস্থা , খামারে পোনা মজুদের হার ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে চিংড়ি চাষ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। সমগ্র বিশ্বে চিংড়ি চাষ পদ্ধতিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) সনাতন চাষ পদ্ধতি (২) আধানিবিড় চাষ পদ্ধতি ও (৩) নিবিড় চাষ পদ্ধতি ।

(ক) সনাতন চাষ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে অন্য স্থানে যেমন- লবণ বা ধানের সাথে পর্যায়ক্রমে চিংড়ি চাষ করা হয় । চিংড়ি চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি সবচেয়ে পুরাতন এবং কম ঝুঁকিপুর্ণ । এই চাষ পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় । এক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা হয় না বা খামার নির্মাণ করা হয় না। খামারের সুনির্দিষ্ট কোনো আকার নেই এবং এর তলদেশ অসমতল এবং পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। খামারের পানি ও খাদ্য সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল । তাই চাষ চলাকালে খামারে কোনো বাড়তি খাবার প্রয়োগ করা হয় না । এ পদ্ধতিতে খামারের মাটি ও পানির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য চুন বা সার প্রয়োগ করা হয় না এবং পানি ব্যবস্থাপনারও কোনো সুব্যবস্থা থাকে না ।

সনাতন চাষ পদ্ধতিতে খামারে চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছও একত্রে চাষ করা হয় । চাষের জন্য জমির চার পাশে ৩-৪ ফুট করে বাঁধ নির্মাণ করা হয় । মাঘী পুর্ণিমার সময় জোয়ারের পানি ঢুকিয়ে খামার পানিতে পুর্ণ করা হয়। জোয়ারের এই পানির সাথে গলদা সহ অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের পোনা খামারে প্রবেশ করে। এর সাথে উপকূলীয় নদী থেকে সংগৃহীত পোনা মজুদ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ১-১.৫টি হারে চিংড়ির মজুদ করা হয় এবং হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি থেকে ২৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়ে থাকে । বাংলাদেশে বর্তমানে মোট চিংড়ি খামারে প্রায় ৮৫-৯০ ভাগ এই চাষ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

(খ) স্বল্প উন্নত চাষ পদ্ধতি: এটি কম ঝুঁকিপুর্ণ, অধিক লাভজনক, কম প্রযুক্তি নির্ভরশীল এবং মধ্যম বিনিয়োগ সম্পন্ন চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাটি ও পানির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য চুন ও সার প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্চিত জলজপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সাধারণত খামারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এই চাষ পদ্ধতির খামারের আয়তন মাঝারি, আয়তকার এবং খামারের তলদেশে সমতল ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থকে। এই জাতীয় খামারে প্রতি বর্গমিটারে ৩-৫টি হারে পোনা মজুদ করে হেক্টর প্রতি ৪০০-৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

পানির লবণাক্ততা ও পোনার প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে একই জমিতে দুটি ফসল উৎপাদন করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৫-২০% জমিতে এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্চিত জলজ প্রাণী দমনের জন্য জোয়ারের পানি খামারে ঢুকানোর সময় সূক্ষ্ম নেটের সাহায্যে পানি ছেঁকে

ঢুকানো হয়। এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কম প্রযুক্তি নির্ভরশীল হওয়ায় এটা বাংলাদেশের জন্য অধিক উপযোগী।

(গ) আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে সতর্কতার সাথে চিংড়ি চাষ করতে হয়। এই পদ্ধতিতে বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় এবং অধিক দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। এই চাষ ব্যবস্থাপনায় পুকুর সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং চিংড়ি পোনার উপযুক্ত প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য পরিমিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা হয়। পাম্প মেশিনের সাহায্যে পানি মজুদ ও শোধন করে খামারে পানি সরবরাহ করা হয় এবং খামারের পানিতে হালকা স্রোত সৃষ্টি করা ও পুকুরের তলদেশ পরিষ্কার রাখার জন্য প্যাডেল হুইল ও এয়ার ইনজেক্টর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হয়।

খামারে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত ক্ষতিকর জলজ প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নিয়ন্ত্রিতভাবে পানি ঢুকানো হয় এবং অনেক সময় মহুয়া বীজের খৈল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ ব্যবস্থাপনায় খামারের আয়তন ২ হেক্টরের কম হওয়া উচিত এবং সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ৭-১৫টি হারে চিংড়ি পোনা মজুদ করা হয়। আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৩-৫ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। পানির গুনাগুণ যেমন-লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, ঘোলাত্ব, অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে রেখে এই চাষ পদ্ধতিতে কাঙ্খিত পর্যায়ে চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব।

(ঘ) নিবিড় চাষ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন হয় । নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

- সাধারণত ০.২৫-১.০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট আয়তকার পুকুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
- পুকুরে পানি প্রবেশ ও নিষ্কাশনের জন্য ইনলেট ও আউটলেট গেইট ব্যবহার করা হয় এবং এজন্য পানি সরবরাহ খাল ও পানি নিষ্কাশন খাল থাকে। তাছাড়া সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহের সুবিধার্থে পাইপ লাইন থাকে।
- পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পেডেল হুইল এবং পুকুরের তলদেশ পরিষ্কারের জন্য এয়ার ইনজেক্টর ব্যবহার করা হয়।
- প্রতি বর্গমিটারে ২০-২৫ টি চিংড়ি মজুদ করা হয়।
- সম্পূরক খাদ্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ১০-২০ টন চিংড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের প্রয়োজনীয় পোনার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ পোনা প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ফলে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পোনা সরবরাহ পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

২.৩.২ দেশে প্রচলিত গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে ২ টি পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। একক চাষ পদ্ধতি ও মিশ্র চাষ পদ্ধতি।

একক চাষ পদ্ধতি: এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গলদা চিংড়ির পিএল ঘের বা পুকুরে ছাড়া হয়। এ সাথে অন্য কোনো প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় না।

সুবিধাঃ এ পদ্ধতিতে চিংড়ি দ্রুত বৃদ্ধি পায়

- পরিচর্যা করা সহজ হয়,
- বড়গুলো সহজেই ধরে নেয়া যায়,
- খাদ্য প্রয়োগ সহজ হয়।

অসুবিধাঃ এ পদ্ধতিতে পুকুরের সকল স্তরের খাদ্য ব্যবহৃত হয় না।

মিশ্র চাষ পদ্ধতি: একই জলাশয়ে একই সময়ে যখন গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য এক বা একাধিক প্রজাতির মাছ এক সাথে চাষ করা হয় তখন তাকে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বলে। এ জাতীয় চাষ পদ্ধতিতে জলাশয়ের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যাপারে কেউ কারও প্রতিযোগী হয় না।

সুবিধাঃ

- পুকুরের সর্বস্তরের খাবারের ব্যবহার নিশ্চিত হয়,
- তুলনামূকভাবে লাভজনক,
- রোগব্যাধি কম হয়।

অসুবিধাঃ

- গলদার সাথে চাষযোগ্য কার্পের প্রজাতির নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্খিত লাভ নাও হতে পারে।
- মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় অধিক মনোযোগী হতে হয় বিধায় চাষির পক্ষে চাষ সম্ভব নাও হতে পারে।

২.৩.৩ মিশ্রচাষে জাত নির্বাচন

গলদা চিংড়ির সাথে সিলভার কার্প ও কাতলা মিশ্র চাষে ব্যবহার করা যায়। সতর্ক থাকতে হবে যে পুকুরের তলায় বসবাসকারী ও খাদ্যগ্রহণকারী কোনো মাছের প্রজাতির গলদা চিংড়ির সাথে মিশ্রভাবে ব্যবহার যাবে না।

প্রজাতি নির্বাচন: মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের মূলভিত্তি হচ্ছে পুকুর বা ঘেরের পানিতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা। পুকুর বা ঘেরের পানির উপরস্তর, মধ্যস্তর ও নিম্নস্তরে আলাদা আলাদা প্রাকৃতিক খাবার জন্মায়। অন্যদিকে পুকুরে যে সব প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি চাষ করা হয় এদের খাদ্য অভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে

থাকে। কেবলমাত্র সরপুঁটি ও গ্রাসকার্প মাছ পানির সকল স্তরে বিচরণ করে। সে কারণে পুকুরে যদি শুধুমাত্র কোনো একস্তরে বসবাসকারী মাছ বা চিংড়ি ছাড়া হয় তাহলে এরা ঐ স্তরের খাদ্য ও বাসস্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে কিন্তু অন্য স্তর অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। তাই পোনা মজুদের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পুকুরের সকল স্তরের খাদ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এ ধরনের চাষকে মিশ্র চাষ বলে যা একক চাষের চেয়ে লাভজনক।

শুধু কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষে ৬-৭ প্রজাতির পোনা মজুদ করা গেলেও কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষে মৃগেল, কার্পিও বা মিরর কার্পের পোনা মজুদ করা ঠিক নয়। কারণ এরা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য চিংড়ির সাথে প্রতিযোগিতা করে। চিংড়ির সাথে মিশ্রচাষের জন্য কাতলা, সিলভার কার্প ও রুই হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী প্রজাতি। তবে বিগহেড এবং সরপুঁটিও লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। চিংড়ির সাথে চাষের জন্য উপরিল্লিখিত প্রজাতিগুলোর এলাকাগত প্রাপ্যতা বিবেচনা করেই প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়।

২.৩.৪ গলদা চিংড়ির চাষ

পুকুরের সকল স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছের পোনা ও জুভেনাইল মজুদের উপর মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। অতি ঘনত্বে মাছের পোনা ও চিংড়ির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, অক্সিজেন ও বাসস্থানের তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। যার কারণে আশানুরূপ উৎপাদন এবং লাভ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করলেও মোট উৎপাদন কমে যায়। সে কারণে পুকুরের সার্বিক অবস্থায় ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পোনার মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করতে হয়। লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি উৎপাদনের জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলো।

২.৩.৪.১ পুকুর উৎপাদনশীলতা

মাটি ও পানির গুনাগুণ ভেদে কোনো একটি জলাশয়ে মাছের পোনা ও চিংড়ির জুভেনাইলের মজুদ ঘনত্ব কম বেশি হতে পারে। যেমন- বেলে ও এঁটেল মাটির উৎপাদনশীলতা দো-আঁশ মাটির চেয়ে কম। ফলে দো-আঁশ মাটির পুকুরে তাদের মজুদ ঘনত্ব অন্যান্য মাটির পুকুরের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে।

২.৩.৪.২ কাঙ্খিত উৎপাদন আকার

যদি নির্দিষ্ট সময়ে বড় আকারের মাছ ও চিংড়ি উৎপাদন করতে (৫-৬ মাসে মাছ ৫০০ গ্রাম-১ কেজি এবং চিংড়ি ৮০ গ্রাম) হয় তবে কম ঘনত্বে পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করা উচিত। মজুদ ঘনত্ব বেশি হলে একই সময়ে মাছ ও চিংড়ির গড় ওজন কম হবে।

২.৩.৪.৩ পোনার আকার

পুকুরে বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল (মাছ ১০-১৫ সেমি এবং চিংড়ি ৫-৭ সেমি) মজুদ করা হলে কম সময়ে বেশি উৎপাদন পাওয়া যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুদের সময় বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইল পাওয়া যায় না; ফলে ছোট আকারের পোনা ও জুভেনাইল কিছুটা বেশি ছাড়া যায়। বড় আকারের পোনা ও জুভেনাইলের ক্ষেত্রে মজুদ ঘনত্ব ২৫% কম হতে পারে।

২.৩.৪.৪ পুকুরের ধরন

পুকুরের ধরনের ওপরও মাছ ও চিংড়ির মজুদ ঘনত্ব নির্ভর করে। সে কারণে মৌসুমী ও বাৎসরিক পুকুরের মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে।

২.৩.৪.৫ চাষের ধরন

চাষের ধরন যেমন- একক ও মিশ্র চাষে মজুদ ঘনত্ব ভিন্ন হয়ে থাকে।

২.৩.৪.৬ ব্যবস্থাপনার ধরন

পুকুরে শুধুমাত্র সার ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব কিছু কম এবং সার ও খাদ্য দুই-ই ব্যবহারে মজুদ ঘনত্ব বেশি হতে পারে। আবার জলাশয়ে আংশিক পানি বদল ও বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকলে আরও অধিক ঘনত্বে মজুদ করা যেতে পারে। কোনো পুকুরে পোনা মজুদ ঘনত্ব মজুদ হার প্রকৃতই উহার ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলি, চাষ ও ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলির আলোকে পুকুর এবং ঘেরে চাষের জন্য নিচে একক ও মিশ্রচাষের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো-

ক) মৌসুমী পুকুর

একক চাষঃ গলদা চিংড়ি- ৫৫টি পোনা/ শতাংশ। তবে খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে এই মজুদ ঘনত্ব দেড় থেকে দুই গুণ বাড়ানো যায়।

মিশ্র চাষঃ ঘনত্ব/শতাংশ

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২
গলদা	৩০টি	৩০টি
সিলভার কার্প	২০টি	৫টি
সরপুঁটি	৫টি	২০টি
মোট	৫৫টি	৫৫টি

খ) বাৎসরিক পুকুর

একক চাষঃ গলদা চিংড়ি ৫০-৭০টি/শতাংশ। প্রতিপালনের সময় ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে এই মজুদ ঘনত্ব আরও দেড় থেকে দুইগুণ বৃদ্ধি করা যায়। গলদা-কার্প মিশ্রচাষে গ্রাস কার্প মজুদ না করাই ভালো।

যদি মজুদ করতে হয় তবে প্রতিদিন গ্রাসকর্পের ওজনের নির্দিষ্ট মাত্রায় সবুজপাতা জাতীয় খাদ্য অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

কার্প-চিংড়ি মিশ্র চাষ- মজুদ ঘনত্ব/শতাংশ

প্রজাতি	আকার (সেমি)	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪	মন্তব্য
গলদা চিংড়ি	৩-৫	৩৩-৩৫	৩৩-৩৬	৩৩-৩৪	৩৪-৩৫	চিংড়ির আকার ৬-৮ সেমি হওয়ার পর ১০-১৪ সেমি আকারের কার্প পোনা মজুদ করতে হবে
কাতলা	৭-১০	২-৩	১০-১১	-	৪-৫	
সিলভার কার্প	৭-১০	৯-১০	-	৯-১০	৫-৬	
বিগহেড	৭-১০	-	-	২-৩	-	
রুই	৭-১০	৪-৫	৫-৬	৫-৬	৫-৬	
গ্রাসকার্প	১০-১৫	-	১-২	১-২	২-৩	
সরপুঁটি	৩-৫	২	-	-	-	
মোট		৫০-৫০টি	৫০-৫০টি	৫০-৫০টি	৫০-৫০টি	

গ) ঘের

ঘেরে বিভিন্ন কৌশলে পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করে চিংড়ি চাষ করা হয়ে থাকে সে কারণে মজুদ ঘনত্বের তারতম্য দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন কৌশলের ওপর ভিত্তি করে মজুদ ঘনত্বের নমুনা উল্লেখ করা হলো-

(ক) ঘেরটি যখন পুরোপুরি বড় চিংড়ি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়-

(খ) ঘেরটি প্রথমে নার্সারি ও পরে মজুদ কাজে ব্যবহৃত হলে ৮০-১০০টি পিএল/শতাংশ

(গ) ঘেরটি পুরোপুরি নার্সারি হিসেবে ব্যবহৃত হলে ১,০০০-২,০০০টি পিএল/শতাংশ

প্রজাতি	আকার (সেমি)	পরিমাণ (প্রতি শতাংশে)
গলদা	৩-৫	৫০-৬০
কাতলা	৭-১০	৬-৮
সিলভার কার্প	৭-১০	৬-৮
রুই	৭-১০	৪-৬
গ্রাসকার্প	৭-১০	০-১
	মোট	৬৬-৮৩টি

২.৪ ভালো মানের গলদা পোনা শনাক্তকরণ

শুধু সঠিক সংখ্যায় পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করলেই ভালো উৎপাদন পাওয়া যাবে না। কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়ার জন্যে সঠিক মজুদ ঘনত্বের পাশাপাশি ভালো মানসম্পন্ন সুস্থ সবল পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। পোনা ও পিএল বা জুভেনাইলের উৎস এবং হ্যান্ডলিং এদের গুণগত মানকে

প্রভাবিত করে। যে কোনো কারণেই গুণগত মান খারাপ হোক না কেন ঐ সমস্ত পোনা ও পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করা হলে চাষি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। যথাযথ মানসম্পন্ন পোনা ও জুভেনাইল মজুদ করা না হলে-

- মজুদের পর ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে,
- বৃদ্ধির হার কম হয়,
- সময়মতো বিক্রয়যোগ্য না হওয়ায় বাজার মূল্য কম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সে কারণে পুকুরে মজুদের পূর্বে এদের যথাযথ গুণগতমান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। ভালো ও খারাপ পোনা ও জুভেনাইল শনাক্তকরণের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো -

চিংড়ির জুভেনাইল

- ভালো জুভেনাইলের দেহ নীলাভ-সাদা/ছাই রংয়ের হয়,
- ভালো জুভেনাইলের অ্যান্টেনা ও উপাঙ্গসমূহ ভাঙ্গা থাকে না,
- ভালো জুভেনাইলের খোলস পরিষ্কার হয়,
- ভালো মানের জুভেনাইলের খাদ্যথলি পরিপূর্ণ, খারাপ মানের জুভেনাইলের খাদ্যথলি আংশিক পূর্ণ বা খালি থাকে।



চিত্র-২.৩: গলদা চিংড়ি জুভেনাইল

২.৫ গলদা চিংড়ি চাষে মাটির গুণাগুণ

মাটির গুণাগুণ ও উর্বরতার ওপর পানির গুণাগুণ ও উর্বরতা নির্ভরশীল আর পানির উর্বরতার ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। তাই খামার বা পুকুর নির্মাণের স্থান নির্বাচনের পূর্বে মাটির গুণাগুণ জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক বস্তু বিশেষ। ক্ষয়ীভূত শিলা ও খনিজের সাথে জৈব পদার্থ ও পানির

২০২৫

মিশ্রণের ফলে মাটি তৈরি হয় । কঠিন, তরল ও বায়বীয় আকারের খনিজ দ্রব্য এবং জলীয় ও বায়বীয় অংশ সমন্বয়ে মাটি গঠিত। চিংড়ি চাষে মাটির গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ:

উপকরণের নাম	উপকরণ পরিমাণ			
	আয়তনভিত্তিক		ওজনভিত্তিক	
	মাত্রা	গড়	মাত্রা	গড়
খনিজ	৪০-৫০	৪৫	৬০-৮৫	৭৩
জৈব	৫-১০	৫	২	২
বায়ু	১-৫০	২৫	১	১
পানি	১-৫০	২৫	১৫-৩৫	২৫

মাটির ৪টি গঠন দ্রব্য-খনিজ, জৈব, বায়ু ও পানি সমন্বিতভাবে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। মাটিতে পানির পরিমাণের ওপর বায়ুর পরিমাণ নির্ভরশীল অর্থাৎ মাটিতে পানির পরিমাণ বাড়লে বায়ুর পরিমাণ কমে যায় এবং পানির পরিমাণ কমলেও বায়ু চলাচল বেড়ে যায়। আবার মাটিতে খনিজ দ্রব্যের আকার বড় হলে এবং নুড়ি বা স্থুল বালি কণার পরিমাণ বেশি হলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। মাটিতে কাদার পরিমাণ বেশি হলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটিতে বায়ু চলাচল কমে যায় । মাটিতে জৈব পর্দাথের পরিমাণ বেশি হলে মাটির গুণাগুণ উন্নত হয় এবং মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মাছ বা চিংড়ি চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির পিএইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, জৈব পদার্থ ইত্যাদি উপাদানের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। মাছ চাষের জন্য মাটির উপরোক্ত উপাদানগুলোর মাত্রা নিম্নরূপ হলে ভালো হয়-

উপাদানের নাম	গুনাগুণ
পিএইচ	৬.৫-৯
ফসফরাস	১০-১৫ মিগ্রা/১০০ গ্রাম
নাইট্রোজেন	৮-১০ মিগ্রা/১০০ গ্রাম
জৈব পদার্থ	১-২% জৈব কার্বন

২.৬ গলদা চিংড়ি চাষে পানির গুণাগুণ

পুকুরের উর্বরতা বা জৈব উৎপাদন নির্ভর করে পুকুরের পানির ভৌত-রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। পুকুরের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

২.৬.১ ভৌত গুণাগুণ

পানির গভীরতাঃ উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলের গভীরতার কারণে সূর্যালোকের প্রভাবে পানিতে তিনটি স্তরের সৃষ্টি হয়। যথা-ইপিলিমনিয়ন (উপরের স্তর), থার্মোক্লাইন (মধ্য স্তর) এবং হাইপোলিমনিয়ন (নিচের স্তর)। বাংলাদেশের অধিকাংশ পুকুরগুলোর গভীরতা ২-৩ মিটার। ফলে হাইপোলিমনিয়ন স্তরটি দেখা যায় না। উপরের স্তরই মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। নার্সারি পুকুরের গভীরতা বেশি হলে চিংড়ির পিএল পানির চাপ সহ্য করতে পারে না। পিএল অগভীর পানিতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। নার্সারি পুকুরের গভীরতা ৭৫-৯০ সেমি (২.৫-৩.০ ফুট) হলে ভালো হয়।

তাপমাত্রাঃ পানির তাপমাত্রার সাথে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন এবং গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনে সহায়ক তাপমাত্রা ২৫-৩১° সে.।

সূর্যালোকঃ সূর্যালোকের প্রাপ্যতা ও প্রখরতার ওপর সালোকসংশ্লেষণ নির্ভরশীল যা থেকে পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদন ও অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। গলদা নার্সারি পুকুরে দৈনিক কমপক্ষে ৬-৮ ঘন্টা সূর্যালোক পড়া আবশ্যক।

২.৬.২ রাসায়নিক গুণাগুণ

অক্সিজেনঃ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উৎস প্রধানত দুটি-

- পানি সংলগ্ন বাতাস ও
- সালোকসংশ্লেষণ।

তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, অন্যান্য গ্যাসের আংশিক চাপ বাড়ার সাথে সাথে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। বায়ু চাপ বাড়লে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা বাড়ে। নার্সারি পুকুরে অক্সিজেনের মাত্রা ৫-৭ পিপিএম হলে ভালো হয়।

অ্যামোনিয়াঃ মাছ ও চিংড়ির বর্জ্য, অভুক্ত খাদ্য, বিভিন্ন দ্রব্যের পচন ইত্যাদির ফলে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয়। যার আধিক্য গলদা নার্সারির জন্য ক্ষতিকর। অআয়নিত অ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিগ্রা/লিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়।

নাইট্রাইটঃ এটি ব্যাকটেরিয়া দহনের ফলে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রাইটের মধ্যবর্তী অবস্থা। পুকুরের তলার পচা পদার্থ বেড়ে গেলে অক্সিজেনহীন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া নাইট্রেটকে নাইট্রাইটে পরিণত করে। নাইট্রাইটের খুব স্বল্পমাত্রাও গলদা চিংড়ির জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। পানিতে নাইট্রাইটের মাত্রা ০.১ মিগ্রা/লিটারের কম থাকা উচিত।

কার্বন ডাই-অক্সাইডঃ পানিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উৎস প্রধানত জৈব পদার্থের পচন ও জলজ জীবের শ্বাস প্রশ্বাস। মুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানির পিএইচ এর মান ৪.৫ পর্যন্ত নামাতে পারে। পানিতে ১২মিগ্রা/লি যুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গলদা চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বিষাক্ততা অক্সিজেনের মাত্রার ওপর নির্ভশীল। পানিতে এ গ্যাস বেশি থাকলে জলজ প্রাণির অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়।

ক্ষারত্ব ও খরতাঃ পানিতে উপস্থিত কার্বনেট, বাই কার্বনেটের ঘনত্বই ক্ষারত্ব এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এর যৌথ ঘনত্বই হচ্ছে খরতা। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য হালকা খর পানি সবচেয়ে ভাল। পানির ক্ষারত্ব ও খরতার মান ২০ মিগ্রা/লি এর কম বা খুব বেশি বেড়ে গেলে বাফারিং ক্ষমতা কমে যায়, প্রাথমিক উৎপাদন কমে যায়, সারের কার্যকারিতা কমে যায়, গলদা চিংড়ি সহজেই অম্লতা ও অন্যান্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। ক্ষারত্ব ও ক্ষরতার মান ৪০-২০০ মি.গ্রা./লি হওয়া উচিত।

পিএইচঃ পিএইচ হচ্ছে কোন বস্তুর অম্লতা বা ক্ষারত্বের পরিমাপক। পানির পিএইচ বলতে পানির অম্লতা বা ক্ষারত্বের অবস্থা বুঝায় যা ১ হতে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। নিরপেক্ষ মান ৭ দ্বারা নির্দেশিত হয়। পিএইচ এর মান ৭ এর কম হলে অম্লতা এবং ৭ এর বেশি হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। গলদা চিংড়ির নার্সারির ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান খুই গুরুত্বপূর্ণ। গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ এর মান ৭.৫ - ৮.৫ এর মধ্যে থাকা সবচেয়ে ভালো।

লবণাক্ততাঃ গলদা চিংড়ি মিঠা পানির চিংড়ি, তবে অল্প লবণাক্ততায় গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের ক্ষেত্রে পানির লবণাক্ততা ০-৪ পিপিটি হওয়া উচিত।

২.৭ মাছ ও চিংড়ি চাষে ঋতুভিত্তিক ঝুঁকি

মাছ ও চিংড়ি চাষের বেশ কিছু ঋতুভিত্তিক ঝুঁকি থাকে। এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এমন কি অনেক সময় সমস্ত চাষ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়তে পারে। ঝুঁকি গুলো হচ্ছে-

(১) বর্ষাকালীন ঝুঁকিঃ বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি বা বন্যায় সমস্ত মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে। তাই সময়ের আগেই বিক্রয়যোগ্য মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা উচিত।

(২) শুষ্ক মৌসুমের ঝুঁকিঃ শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর নীচে নেমে যেতে পারে বা পানির গভীরতা কমে যেতে পারে । এ অবস্থায় পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফলে সমস্ত মাছ ও চিংড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) শীতকালীন ঝুঁকিঃ শীতকালীন ঝুঁকির অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে মাছের ক্ষতরোগ। এ রোগ সাধারণত নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসেই বেশি দেখা যায়। এ সময়ে পুকুরে জীবভর (বায়োমাস-কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সমগ্র জীবসমষ্টি) বেশি থাকলে এ রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সে কারণে এ সময়ের আগেই বড় মাছ ও চিংড়ি পুকুরের জীবভর কমিয়ে দেওয়া উচিত।

(৪) চুরিঃ এটি সামাজিক ঝুঁকি। পুকুরে মাছ ও চিংড়ি বড় হলে এ ঝুঁকি বেড়ে যায়। সে কারণে বড় মাছ ও চিংড়ি আংশিক আহরণ করলে চুরির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

২.৮ গলদা চিংড়ির খামারের স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশল

গলদা চিংড়ি চাষের উপযোগী পরিবেশ বলতে এমন একটি পরিবেশকে বুঝায় যেখানে অবকাঠামোগত সুবিধা, পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পানির প্রাপ্যতা উৎপাদন সামগ্রীর সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত চিংড়ির সঠিক গুণগতমাণ বজায় রেখে চিংড়ি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়।



চিত্র ২.৪: গলদা চিংড়ি খামার

২.৮.১ স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ি চাষের জন্য খামার নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে-

মাটির গুণাগুণ: এঁটেল মাটি, এঁটেল দো-আঁশ কিংবা বেলে দো-আঁশ মাটি পুকুর নির্মাণের জন্য সবচেয়ে ভালো। অ্যাসিড সালফেট যুক্ত কিংবা বেলেযুক্ত মাটি পুকুর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়।

পানির গুণাগুণ: পানির গুণাগুণের ওপর চিংড়ির উৎপাদন নির্ভরশীল। গলদা খামারের জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন স্বাদু পানি সহজেই পাওয়া যায়। স্বাদু বা মিঠা পানিতে সাধারণত গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়। তবে ৪ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ত পানিতে গলদা চাষে কোনো সমস্যা হয় না। পানির তাপমাত্রা ১৮° সে এর নিচে এবং ৩৫° সে এর উর্ধ্বে হলে চিংড়ির মৃত্যু ঘটে। পানির তাপমাত্রা ২৪° সে এর নিচে নামলে এবং ৩১° সে এর বেশি হলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়।

বন্যা, প্লাবন ও দূষণমুক্ত এলাকা: হঠাৎ বন্যা, প্লাবন বা ঢলে খামার যেন তলিয়ে না যায় এমন স্থানে খামার স্থাপন করতে হবে। শহরের ময়লা আবর্জনা এবং শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিতে

২০২৫

মিশে পানি দূষণ করে। এই পানি গলদা চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত পানি গলদা খামারে ব্যবহার করা উচিত নয়।

পানির উৎস: বৃষ্টির পানি, নদী-খাল বা ভূগর্ভস্থ নলকূপ থেকে পানি গলদার খামারে সরবরাহ করা যায়। খামার এমন জায়গায় স্থাপন করতে হবে যেখানে স্বচ্ছ, দূষণমুক্ত ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ মিঠা পানি সহজেই পাওয়া যায়। নদী বা খালের পানিতে জৈব ও অজৈব ভাসমান পদার্থ কম থাকতে হবে। নলকূপের পানিতে সাধারণত লৌহ বা ভারী ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এসব উৎসের পানি থিতানোর পর খামারে সরবরাহ করা উচিত।

চাষ উপকরণাদির প্রাপ্যতা: গলদা খামার এমন জায়গায় স্থাপন করা উচিত যেখানে চিংড়ির পোনা সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং চিংড়ি চাষের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, চুন, সার, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণাদি সহজে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি: বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সড়ক যোগাযোগ, বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদির অবকাঠামোগত সুবিধাদি আছে এমন এলাকায় চিংড়ি খামার স্থাপন করতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দরকার। চিংড়ি খামারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে খামার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা প্রয়োজন।

দক্ষ জনশক্তি: দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি ছাড়া সফলভাবে চিংড়ি চাষ করা যেমন সম্ভব নয় ঠিক তেমনিভাবে চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। এজন্য সহজে দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় এবং নিয়োগকৃত কর্মচারীগণ যেন বসবাসের ভালো পরিবেশ পায় এমন স্থানে খামার স্থাপন করা উচিত।

বিবিধ: নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা খামার স্থাপনকালে বিবেচনায় রাখা উচিত।

২.৮.২ খামার নির্মাণ কৌশল

খামারের উপযুক্ত নকশা প্রণয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পিত চাষ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। গলদা চিংড়ি খামারে উৎপাদন, লক্ষ্যমাত্রা, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হয়। চাষ সুবিধার জন্য খামারে সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসম্মত পানি সঞ্চালন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এছাড়া পানির গভীরতা ও চাষকৃত চিংড়ির পরিচর্যার জন্য খামারে বিভিন্ন প্রকার পুকুর নির্মাণ করতে হবে। একটি আধুনিক খামারের নকশা চূড়ান্তকরণের পূর্বে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দরকার ।

(১) পানি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা,

(২) পানি নিষ্কাশনের সুবিধা,

(৩) বন্যা বা প্লাবনের সময় পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা,

(৪) মাটির ধরন,

(৫) বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও

(৬) মাটির পানি ধারণক্ষমতা ইত্যাদি।

২.৯ নার্সারি পুকুর ও মজুদ পুকুর সম্পর্কে ধারণা

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য দুই ধরনের পুকুর আবশ্যক, যথা- নার্সারি পুকুর ও মজুদ পুকুর। হ্যাচারি বা নদী থেকে পিএল এনে সরাসরি ঘের বা পুকুরে মজুদ করা উচিত নয় এতে গলদা পোনা বা পিএল অনেক মারা যায় ও কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না, তাই গলদা পোনা প্রথমে নার্সারি পুকুরে ৩০-৪০ দিন লালন পালন করে মজুদ পুকুরে স্থানান্তর করলে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়।

২.৯.১ নার্সারি পুকুর

বাংলাদেশের অধিকাংশ খামারে নার্সারি পুকুর রাখা হয় না। বর্তমানে হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা সরাসরি গলদা চাষের পুকুরে মজুদ করা হয়। এর ফলে পোনার মৃত্যু হার অনেক বেশি হয় এবং চিংড়ি চাষি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা নার্সারি পুকুরে প্রতিপালনের পর মজুদ পুকুরে মজুদ করলে উৎপাদন বেশি হয়। চাষ এলাকার ১০-১৫% এলাকায় নার্সারি পুকুর স্থাপন করা যেতে পারে। বর্গাকার বা আয়তকার নার্সারি পুকুরের আয়তন ৫০০ বর্গমিটার থেকে ১০০০ বর্গমিটার হতে পারে এবং সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে ৩০ থেকে ৫০টি পোনা মজুদ করা যায়। নার্সারি পুকুরে পোনার বাঁচার হার প্রায় ৭০%।



চিত্র-২.৫: নার্সারি পুকুর তৈরী

নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালনের পর মজুদ পুকুরে ৪-৫ মাস প্রতিপালন করে বছরে কমপক্ষে ২টি ফসল উৎপাদন করা যায়। নার্সারি পুকুর ছাড়াও বর্তমানে পেন নার্সারি, ভাসমান নার্সারি বা ট্যাংক নার্সারিতে পোনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। নার্সারিতে পানির সঞ্চালন ও গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পোনার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

২.৯.২ মজুদ বা পালন পুকুর

পালন পুকুর একটি খামারের প্রধান অবকাঠামো যেখান থেকে চিংড়ি চাষের লাভ ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পালন পুকুর বর্গাকার বা আয়তকার হলে ভালো হয়। পালন পুকুরের আয়তন ০.৫ হেক্টর থেকে ১.৫ হেক্টর হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। নির্মাণ খরচ কমানোর জন্য অনেকে ২-৩ হেক্টর আয়তনের পুকুর নির্মাণ করে থাকে।



চিত্র ২.৬: পালন বা মজুদ পুকুর

২.১০ খামারের অবকাঠামো

গলদা চাষের সফলতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খামারের অবকাঠামো সঠিক পদ্ধতিতে নির্মাণের উপর নির্ভরশীল। সঠিকভাবে খামারের অবকাঠামো নির্মাণ করা না হলে একটু ভুলের কারণে মোট ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাই গলদা খামারের অবকাঠামো সঠিক পদ্ধতিতে করা বাঞ্ছনীয়। চাষ সুবিধার জন্য খামারে মূল অবকাঠামোর ব্যবহার ও নির্মাণ পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হলো-

২.১০.১ আয়তন

সাধারণত চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে গলদা চাষের পুকুরের আয়তন নির্ধারণ করা হয়। সনাতন চাষ পদ্ধতিতে পুকুরের আকারের বা আয়তনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মিশ্র চাষ ও আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ০.২৫-২.০ হেক্টরের পুকুরে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয় এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ০.২৫-১.০ হেক্টর আয়তনের পুকুরে গলদা চিংড়ি চাষ করা হয়।

২.১০.২ পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেইট

খামারের প্রতিটি পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেইট থাকা প্রয়োজন। পুকুরের তলদেশ ক্রমান্বয়ে নিষ্কাশন গেইটের দিকে ঢালু থাকা উচিত। এর ফলে প্রয়োজন অনুসারে পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সহজ হয়।

২.১০.৩ খাল খনন

পুকুরের পাড় থেকে ৩ মিটার দূরে পুকুরের ভিতরের দিকে ২ মিটার প্রশস্থ ও ০.৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি খাল পাড়ের চারপাশে এবং পুকুরের মাঝ বরাবর দু'পাড়ের খালের সংযোগের জন্য খাল নির্মাণ করা হয়। এই খাল চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুকুর থেকে চূড়ান্তভাবে চিংড়ি ধরার সময় এসব খাল ব্যবহার করা যায়।

২.১০.৩.১ পানি সরবরাহ খাল: পানি সরবরাহের জন্য যে সমস্ত খামার বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভরশীল সেসব খামারে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন খাল নির্মাণের প্রয়াজেন নেই। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানির অভাব হলে চিংড়ি চাষে বিঘ্ন ঘটে। এজন্য প্রয়োজনে যে কোনো সময় খামারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর এই আপদকালীন সময়ে পানি সরবরাহের জন্যই খামারে পানি সরবরাহ খাল নির্মাণ করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় পানি প্রাপ্তির উৎস থেকে সরাসরি পানি পুকুরে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে পানি সরবরাহ খালের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। পুকুরে সরবরাহের সময় যাতে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণী পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি পুকুরে সুইস গেইট থাকা দরকার। আবার যেসব খামারে শোধনকৃত পানি সরবরাহ করা হয় সেসব খামারে পুকুরের বাঁধের উপর নির্মিত নালার মাধ্যমে অভিকর্ষ পদ্ধতিতে পুকুরে পানি সরবরাহ করা হয়।

২.১০.৩.২ পানি নিষ্কাশন খাল: পুকুর শুকানো এবং পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হয়। নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে পুকুরের পানি নিষ্কাশন করা হয়। এই নিষ্কাশন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পুকুরের তলদেশ পানি প্রবেশ করানোর গেইটের দিক থেকে নিষ্কাশন গেইটের দিকে ঢালু হতে হবে। সাধারণত পুকুরের অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে অভিকর্ষ পদ্ধতিতে পুকুর থেকে নিষ্কাশন করা হয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে খামারের বাইরের পানির উচ্চতা বেশি থাকে বিধায় অনেক সময় খালের মাধ্যমে পানি অভিকর্ষ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় না। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ গলদা খামারেই পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে খামারের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে ২০২৫
এবং চিংড়ির নানা রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১০.৪ পানির গভীরতা

পালন পুকুরে পানির গভীরতা ১-২ মিটার রাখা দরকার। এজন্য পুকুর পাড় থেকে পুকুরের তলার পানির গভীরতা ১.৫ মিটার হলে ভালো হয়।

২.১০.৫ বেস্টনি বাঁধ

বাঁধের উচ্চতা পুকুরের পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে কমপক্ষে ৩.৬০ মিটার উঁচু থাকা দরকার। বেষ্টনী বাঁধ, পুকুর বা খালের বাঁধ যাই নির্মাণ করা হোক তা অবশ্যই ভালাভোবে আঁটসাঁট বা কমপ্যাক্ট করে নির্মাণ করতে হবে। সঠিকভাবে কমপ্যাক্ট করা না হলে বাঁধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং পুকুরের পানি ধরে রাখতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

২.১০.৬ বাঁধের ঢাল

বাঁধের উচ্চতা, মাটির ধরন এবং পানির ঢেউ ও স্রোতের ওপর নির্ভর করে বাঁধের ঢাল নির্ধারণ করা হয়। বেলে দো-আঁশ মাটির পুকুরের বাঁধের বাইরে ও ভিতরে উভয় দিকে ৩:১ এবং এঁটেল মাটিতে ২:১ হারে ঢালু হওয়া প্রয়োজন। এঁটেল মাটির ক্ষেত্রে বাঁধের ঢাল পুকুরের ভিতরের দিকে ১:১ রাখা যায়। একটি বাঁধের উচ্চতা নিম্নবর্ণিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়ঃ

$$\text{বাঁধের উচ্চতা} = \frac{(\text{ক}-\text{খ}+\text{গ})}{\text{১}-\%\ \text{সংকোচন}}$$

এখানে-

ক = সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক সর্বোচ্চ জোয়ারের উচ্চতা,

খ = চাষের জমির উচ্চতা থেকে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতার পার্থক্য এবং

গ = বাঁধ কতটুকু অতিরিক্ত উঁচু করা হবে তার পরিমাণ।

যে কোনো খামারে কোনো বাঁধ নতুনভাবে তৈরি করতে কি পরিমাণ মাটির প্রয়োজন হবে তা সহজেই নিচের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

মোট মাটির পরিমাণ =১/২ (উপরিতলের প্রশস্ততা + ভূমির প্রশস্ততা) × উচ্চতা × মোট দৈর্ঘ্য।

যদি একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার, প্রস্থ ৪০ মিটার, বাঁধের ভূমির প্রশস্ততা ৩ মিটার এবং বাঁধের উপরিভাগের প্রশস্ততা ১ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটার হয় তাহলে তলের বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য হবে ২৮০ মিটার। অতএব মোট মাটির পরিমাণ = ১/২(১+৩) × ২ × ২৮০ ঘনমিটার = ১১২০ ঘনমিটার।

২০২৫

২.১১ পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা

গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি গলদা খামারের পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা পানি সরবরাহ, পানি শোধন, পানি সরবরাহ খাল ও পানি নিষ্কাশন খাল সমন্বয়ে গঠিত। সাফল্যজনকভাবে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য খামারে পরিকল্পিত ও উন্নতমানের পানি সঞ্চালন ব্যবস্থা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পুকুরে পরিকল্পিত ও নিয়মিত পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা যায়।

২.১১.১ পানির উৎস: গলদা চিংড়ি চাষের জন্য তিনটি উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করা যায়। উৎস তিনটি হচ্ছে-

(ক) বৃষ্টির পানি,

(খ) নদী বা খালের থিতানো দূষণমুক্ত পানি ও

(গ) ভূগর্ভস্থ ভারী ধাতুমুক্ত পানি।

গলদা খামারে বর্ষাকালে সাধারণত বৃষ্টির পানি সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে অন্য কোনো উৎস থেকে খামারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা ভালো। চিংড়ি চাষ পদ্ধতি এবং পুকুরে চিংড়ির মজুদ সংখ্যার ওপর নির্ভর করে পুকুরে পানি সরবরাহের পরিমাণ। যে সমস্ত পুকুরে বাইরে থেকে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সে সমস্ত পুকুরে নিয়মিত পানি পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।

২.১১.২ পানি শোধন: খাল বা নদীর পানি পুকুরে সরবরাহের পূর্বে থিতিয়ে নেয়া ভালো, কারণ এ পানিতে দ্রবীভূত ভাসমান জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে যা চিংড়ি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। তাছাড়া এই পানিতে অবাঞ্ছিত প্রাণী, প্রাণির ডিম, লার্ভা ইত্যাদি থাকে যা পানির সাথে পুকুরে প্রবেশ করে চিংড়ির উৎপাদন কমিয়ে দেয়। তাই এই পানি পুকুরে সরবরাহের পুর্বে সরবরাহ খাল বা জলাধারে তা থিতিয়ে ফিল্টার বা ২৫০ মাইক্রন নেটের মাধ্যমে ছেকে পুকুরে সরবরাহ করা উচিত। এর ফলে অবাঞ্ছিত প্রাণির প্রবেশ রোধ করা যায়। ভূগর্ভস্থ পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভারী ধাতু মিশ্রিত থাকে। পানির ভারী ধাতু চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর। এই জন্য ভূগর্ভস্থ পানি পুকুরে সরবরাহের পুর্বে তা সরবরাহ খাল বা জলাধারে পর্যাপ্ত বায়বীয় (Aeration) করে নেওয়া উচিত।

২.১২. গলদা চিংড়ির চাষ পদ্ধতি

চিংড়ি চাষের জন্য খামারে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করে খামারটিকে মজুদের উপযোগী করে তোলাই হচ্ছে খামার প্রস্তুতকরণ। অর্থাৎ পুকুরে চিংড়ি চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে খামার প্রস্তুতকরণের প্রধান উদ্দেশ্য। খামার প্রস্তুতকরণের প্রধান পদক্ষেপগুলো হচ্ছে: পুকুরের পাড় মেরামত, স্লুইস গেইট মেরামত, আগাছা দমন, পুকুর শুকানো, রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন, চুন প্রয়োগ ও পানি সংগ্রহ।

২.১২.১ পাড় মেরামত

চিংড়ি চাষের জন্য পুরাতন পুকুর বা ঘেরে কখনও কখনও পাড় মেরামত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ পুকুরের ভাঙা পাড় মেরামত না করলে নিম্নবর্ণিত সমস্যা দেখা দিতে পারে:

- বাইরে থেকে রাক্ষুসে প্রাণী ও অবাঞ্ছিত মাছ প্রবেশ করতে পারে,
- বর্ষা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মাছ ও চিংড়ি ভেসে যেতে পারে,
- বাইরের দূষিত পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারে ও
- ভেতরের খাদ্যযুক্ত উর্বর পানি বের হয়ে যেতে পারে।



চিত্র-২.৭:গলদা খামারের পাড় মেরামত

২.১২.২. স্লুইস গেইট মেরামত

গলদা চিংড়ির পুকুরে পানি সরবরাহ খালে ছোট ছোট স্লুইস গেইট স্থাপন করা থাকে। এসব স্লুইস গেইট ভেঙে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো মেরামত বা পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা পুকুরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটবে। ফলে চিংড়ি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।



চিত্র-২.৮: গলদা খামারের স্লুইস গেট

১০২৫

২.১২.৩ জলজ আগাছা দমন

জলজ উদ্ভিদ বলতে অতি ক্ষুদ্র শেওলা যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় সে রকম উদ্ভিদ থেকে কচুরিপানা, কলমিলতা পর্যন্ত সব উদ্ভিদকে বুঝায়। পুকুরে অল্প পরিমাণ উদ্ভিদ চিংড়ি চাষের সহায়ক হলেও এর পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হলে তা চিংড়ি চাষের জন্য অনেক সময় মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। পুকুরের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের সহাবস্থান প্রয়োজন। তবে চিংড়ি চাষের জন্য আগাছা সীমিত পর্যায়ে রাখতে এর নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। গলদা চিংড়ির পুকুরে জলজ উদ্ভিদের ক্ষতিকর দিকসমূহ নিম্নরূপ:

- চিংড়ির আশ্রয়স্থল দখল করে ফেলে,
- রাক্ষুসে মাছের আবাসস্থল সৃষ্টি করে,
- পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে পানির উর্বরা শক্তি কমিয়ে ফেলে,
- অবাঞ্ছিত প্রাণী যেমন- সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতির আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়,
- জলজ উদ্ভিদ পুকুর থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে,
- পানিতে সূর্যালোক পৌছাতে বাধার সৃষ্টি করে, ফলে সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া ব্যাহত হয়,
- জলজ উদ্ভিদ পঁচে পুকুরের পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে,
- চিংড়ির চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি করে ও
- চিংড়ি আহরণে বাঁধার সৃষ্টি করে।

বৃদ্ধি, স্বভাব ও বাসস্থলের প্রকৃতি অনুসারে জলজ উদ্ভিদকে নিচের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(১) শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ: অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ, তন্তু জাতীয় উদ্ভিদ এবং দলবদ্ধ উদ্ভিদ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। শেওলা সাধারণত পানির উপরিভাগে অবস্থান করে। পুকুরে সাধারণত তিন ধরনের শেওলা দেখা যায়। যথা

ক) শাখাযুক্ত শেওলা: এই জাতীয় শেওলা শাখাযুক্ত এবং পুষ্পবাহী উদ্ভিদের মতো। এই শেওলার কোনো অংশ পানির উপরিভাগের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় না। যথা-চারা, নিটেলা ইত্যাদি।

খ) তন্তু জাতীয় শেওলা: এই জাতীয় শেওলা খালি চোখে দেখা যায়। পুকুরের পাড় ও তলদেশে এরা জন্মায় এবং পরে পানির উপরিভাগে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- ইউলোথ্রিক্স, স্পাইরোগাইরা, ক্লাডোফোরা ইত্যাদি।

গ) এককোষী বা দলবদ্ধ শেওলা: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই জাতীয় শেওলা ভালোভাবে দেখা যায়। এই জাতীয় শেওলা পানির উপরিভাগে জন্মায় যা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই শেওলার আধিক্য পানিতে সূর্যালোক পৌছাতে বাধা দেয়। যেমন- ইউগ্লেনা, ডায়াটম, ভলভক্স ইত্যাদি।



চিত্র ২.৯: শাখাযুক্ত শেওলা, তন্তুযুক্ত শেওলা ও এককোষী শেওলা

(২) নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ: এই জাতীয় উদ্ভিদের কান্ড ও পাতা পানির তলদেশে জন্মায়। এ জাতীয় উদ্ভিদকে ডুবন্ত উদ্ভিদ বলা হয়। এগুলি থাকলে চিংড়ি বা মাছের স্বাভাবিক চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন- পাতা ঝাঝি, কাঁটা ঝাঝি ইত্যাদি।



চিত্র ২.১০: নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ

(৩) ভাসমান উদ্ভিদ: এ জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে। আবার কিছু উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের তলদেশে মাটিতে থাকে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে জলজ আগাছা হিসেবে পরিচিত। যথা- কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।



চিত্র ২.১১: ভাসমান উদ্ভিদ

(৪) নির্গমনশীল উদ্ভিদ: এই উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের তলদেশে মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে। এই উদ্ভিদের অংশ বিশেষ পানির উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যেমনঃ বিষকাটালি, আড়াইল ইত্যাদি।



চিত্র ২.১২: নির্গমনশীল উদ্ভিদ

(৫) লতানো উদ্ভিদ: এই জাতীয় উদ্ভিদের শিকড় পুকুরের পাড়ে থাকে কিন্তু এদের কান্ড ও পাতা পানির উপরিভাগে থাকে এবং পানির উপরিভাগকে প্রায় আবৃত করে ফেলে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি।



চিত্র ২.১৩: লতানো উদ্ভিদ

২.১৩ আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

জলজ উদ্ভিদ পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে ফলে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয়। তাই চিংড়ি চাষের পুকুরে আগাছা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে খুব অল্প সময়েই একটি পুকুর অনাবাদী বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হতে পারে। পুকুরের আগাছা দমন ও নিয়ন্ত্রণ চারটি উপায়ে করা যায়। যথা-

ক) কায়িক শ্রম পদ্ধতি: পুকুরের যাবতীয় আগাছাকে দা বা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে হাত দিয়ে তুলে ফেলা যায়। কখনো কখনো পুকুরে দড়ি টেনে আগাছার শিকড় আলাদা করে পরে টেনে তোলা যায়।

২০২৫

খ) যান্ত্রিক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ বেশ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য। স্টিল ক্যাবল দিয়ে শেওলা ছাড়া সব ধরনের জলজ আগাছা পরিষ্কার করা যায়। পক্ষান্তরে উইডস দিয়ে কেবল নরম জাতীয় নিমজ্জনশীল উদ্ভিদ দমন করা যায়।

গ) জৈবিক পদ্ধতি: জলজ আগাছা দমনের জন্য জৈবিক পদ্ধতি অধিক নিরাপদ, কার্যকর ও খরচ অনেক কম। এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের জন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের জন্য রাজহাঁস ও পাতিহাঁস এবং গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি প্রভৃতি মাছ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘ) রাসায়নিক পদ্ধতি: পুকুরে চিংড়ি থাকা অবস্থায় কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা উচিত নয়। এই পদ্ধতিতে আগাছা দমনের পূর্বে কোনো মৎস্যবিজ্ঞানী বা নিকটবর্তী মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। কপার সালফেট, সোডিয়াম আরসেনাইট, ২-৪ ডি, এ্যাকুয়াথল প্লাস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন প্রকার জলজ আগাছা দমনে ব্যবহার করা হয়।

ঙ) সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পুকুরে ডুবন্ত উদ্ভিদ থাকলে বেশী পরিমাণ অজৈব সার প্রয়োগ করে তা দমন করা যায়। পুকুরে যদি ডুবন্ত উদ্ভিদ যেমন- নাজাস থাকে তাহলে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ২-৩ দিনের মধ্যে পুকুরে সবুজ স্তরের সৃষ্টি হয়। ফলে সূর্যালোক না পাওয়ায় অল্প কয়েক দিনের ভেতর নাজাস মারা যায়।

২.১৪ রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন

জলজ আগাছা দমনের পরে পুকুর/গলদা খামার হতে অবশ্যই মৎস্যভূক ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দমন করা হয়ে থাকে। আধুনিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী মুক্ত খামারই উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। রাক্ষুসে মাছ এবং অবাঞ্ছিত মাছ ও প্রাণির ক্ষতিকর দিকসমূহ-

- এরা গলদা চিংড়ি খেয়ে ফেলে,
- গলদা চিংড়ির জন্য সরবরাহকৃত খাবারে ভাগ বসায়,
- এরা চিংড়ির আবাসস্থল দখল করে,
- পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে,
- এরা রোগ জীবাণু ছড়ায় ও
- পুকুরের পাড়ে গর্ত করে পাড় নষ্ট করে ফেলে।

পুকুর শুকিয়ে অথবা নানা ধরনের জৈব ও অজৈব পেস্টিসাইড ব্যবহার করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করা যায়। অবাঞ্ছিত প্রাণী দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি হলো-

২.১৪.১ পুকুর শুকানো : বাংলাদেশে সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পুকুর শুকানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। কারণ এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও খুব কম থাকে। সম্পূর্ণভাবে পানি

নিষ্কাশন করার পর পুকুর ভালোমত শুকাতে ২-৫ সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়। পুকুরের তলদেশ সূর্যালোকে এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে মাটিতে ৪-৫ সেমি ফাটল সৃষ্টি হয়। তবে মাটিতে অ্যাসিড বা কষ থাকলে ফাটল সৃষ্টি না করাই উত্তম। তাছাড়া পুকুরের তলদেশ দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গেলে যদি ৩-৫ সেমি এর বেশি গর্ত না হয় তবে এতেও শুকানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

যে সব পুকুরের পানি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা সম্ভব নয় সে সব পুকুরের পানি এমন পরিমাণে নিষ্কাশন করতে হবে যেন পুকুরের তলদেশ পর্যন্ত প্রচুর সূর্যরশ্মি পৌঁছতে পারে। যে সব পুকুরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিরামভাবে চিংড়ি চাষ করা হয়েছে অথবা পুকুরের তলদেশে যদি কালো রঙের জৈব তলানি সৃষ্টি হতে দেখা যায় তবে পুকুরের তলদেশ কিছুদিন শুকানোর পর ৫-১৫ সেমি গভীর করে ভালোভাবে চাষ দিতে হবে এবং রৌদ্রে আবারও ভালোভাবে শুকাতে হবে। পুকুর শুকানোর উপকারিতা-

- পুকুরের তলদেশ ভালোভাবে শুকানোর ফলে সব ধরনের রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য প্রাণী দূরীভূত হয়।
- পুকুরের তলদেশে বিদ্যমান জৈবিক পদার্থসমূহ আলো বাতাসের প্রভাবে মাটিতে মিশে যায়।
- ফলে মাটিতে পুষ্টিকারক উপাদানের পর্যাপ্ততা ঘটে এবং এতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- মাটিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসসমূহ দূরীভূত হয়।
- পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে মাটিতে বিদ্যমান অনেক ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগজীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
- পুকুরের তলদেশ শুকানোর ফলে মাটির গাঠনিক কাঠামো মজবুত হয়। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধি পায়। মাটি শুকানোর ফলে তলদেশের মাটি পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

২.১৪.২ জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহার: প্রাণী রাক্ষুসে মাছ ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমনের জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব বা রাসায়নিক পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু পেস্টিসাইড আছে যেগুলো প্রয়োগের ফলে মৃত মাছ খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং পুকুরের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাছাড়া এসব পেস্টিসাইডের বিষক্রিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ থাকে। এতে চিংড়ি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য বারবার জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা এবং পুকুর শুকানো সবচেয়ে ভাল। যদি পুকুর সম্পূর্ণরূপে শুকানো সম্ভব না হয় তবে সে ক্ষেত্রে জৈব পেস্টিসাইড হিসেবে রোটেনন, মহুয়ার খৈল, চা বীজ খৈল, তামাকের গুঁড়া প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারে সুবিধাসমূহ নিচে দেয়া হলো-

- পোনা মজুদের পূর্বে জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং ক্ষতিকর পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।
- জৈব পেস্টিসাইড মাছের ফুলকার কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। ফলে মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় এবং মাছের দেহে কোনো বিষ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। এভাবে মৃত মাছ খেলে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

- এদের বিষক্রিয়া অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এরা জৈব সার হিসেবে কাজ করে। ফলে চিংড়ি চাষির আর্থিক সাশ্রয় হয়।

জৈব পেস্টিসাইড প্রয়োগ মাত্রা: পুকুরের পানির আয়তন ও গভীরতা জেনে সুবিধামতো পেস্টিসাইড নির্বাচন করে নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী পরিমাণ জেনে নির্দেশিত উপায়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

পানিতে জৈব পেস্টিসাইড ব্যবহারের মাত্রা-

পেস্টিসাইড	কেজি/হে/মি	কেজি/একর/মি	গ্রাম/শতক/মি	গ্রাম/ঘনমিটার	গ্রাম/ঘনফুট
১. রোটেনন	২০-৩০	৮-১২	৮০-১২০	২-৩	০.০৭
২. চা বীজ খৈল	৪০	১৬	১৬০	৪	০.১১
৩. তামাকের গুঁড়া	২০০-৪০০	৮০-১৬০	৮০০-১৬০০	২০-৪০	০.৮৫

ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ মাত্রা: মাছ ও অন্যান্য প্রাণী দমনের জন্য ৫ নিযুতাংশ হারে ক্লোরিন প্রয়োগ করা যায়। ব্লিচিং পাউডারে ৩০-৬০% ক্লোরিন থাকে। নিচে বর্ণিত ছক অনুযায়ী ব্লিচিং পাউডার পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	পাউডারের পরিমাণ
১	৩০ সেমি (১ ফুট)	৯০০ গ্রাম
১০	৩০ সেমি (১ ফুট)	৯ কেজি
৩৩	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	১৫০ কেজি
৫০	১.৫ মিটার (৫ ফুট)	২৫০ কেজি

২.১৫ চুন প্রয়োগ

পুকুরে পেস্টিসাইড ব্যবহারের পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে চুন প্রয়োগ করা। মাটির উর্বরতা শক্তির ওপর চিংড়ির ফলন নির্ভরশীল বিধায় মাটির শোধন ও উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগকরা দরকার। মাটিতে চুন প্রয়োগের উপকারিতা নিম্নরূপ:

(১) চুন মাটির অম্লত্বকে কমিয়ে আনে ফলে মাটির ক্ষারীয় গুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ মাটির পিএইচ বৃদ্ধি পায়।

(২) চুন বাফার দ্রবণ হিসেবে মাটি বা পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে

(৩) চুন প্রয়োগের ফলে মাটিতে বিদ্যমান ক্ষতিকর জীবসহ পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া এবং তাদের মাধ্যমিক পোষক মারা যায়।

(৪) মাটিতে চুন প্রয়োগকরলে মাটি থেকে পুষ্টিকারক উপাদানের নিঃসরণ ত্বরান্বিত হয়। ফলে মাটির গঠন প্রকৃতি উন্নত হয় এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৫) চুন প্রয়োগের ফলে মাটির ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের বিষাক্ততা দূরীভূত হয় এবং পানিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে জলজ পরিবেশ থেকে জটিল যৌগসমূহ গ্রহণ উপযোগী হয়ে ওঠে।

(৬) চুন প্রয়োগে পানির ঘোলাত্ব দূর হয়। ফলে পুকুরে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

(৭) পুকুরে চিংড়ির চাষের অন্তরায় তন্তুময় শেওলা চুন প্রয়োগ করে দমন করা যায়।

(৮) চুন থেকে প্রাপ্ত ক্যালসিয়াম ও কার্বনেট চিংড়ির খোলস তৈরির একটি অন্যতম উপাদান। ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় চিংড়ির খোলস বদল হয় না বা বদল বিলম্বিত হয়। এমনকি খোলস বদল হলেও তা শক্ত হতে দেরি হয়। ফলে চিংড়ির দেহ দীর্ঘক্ষণ নরম থাকে। এর ফলে চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। চুনের ক্যালসিয়াম চিংড়ির বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

(৯) চুন পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করতে পারে।

(১০) চুনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম পুকুরে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাজারে বিভিন্ন ধরনের চুন পাওয়া যায়। এর সবগুলোই ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের স্থানীয় বাজারে যেসব চুন পাওয়া যায় সেগুলো হলো- পাথুরে চুন, কলি চুন, পাড়ো চুন, ডলামোইট ও জিপসাম। পচা কাদাযুক্ত পুকুরে ডলোমাইট জাতীয় চুন ব্যবহার করা সবচেয়েভালো। কারণ পচা কাদাযুক্ত পুকুরে এই চুনের কার্যকারিতা সবেচেয়ে বেশি। তবে এই চুন আমাদের দেশের স্থানীয় বাজারে এখনও সহজ প্রাপ্য নয়।

চুন প্রয়োগের মাত্রা: মাটির পিএইচ এর ওপর নির্ভর করে চুন প্রয়োগেরমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। মাটির পিএইচ এর মান ৭.০ এর বেশি হলে সেখানে চুন প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। এরূপ মাটি চিংড়ি চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে মাছ চাষের সাধারণ মাত্রার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ মাত্রায় চুন প্রয়োগ করা উচিত। এর ফলে জলীয় পরিবেশ সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত হয় এবং মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ফিরে আসে। যেসব পুকুরের তলদেশে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি সেখানে বেশি পরিমাণে চুন প্রয়োগ করা দরকার।

চিংড়ি চাষ কালে পানির পিএইচ ৭.৫ এর নিচে নেমে গেলে অথবা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পিএইচ এর তারতম্য ০.৫ এর বেশি হলে পানিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (ডলোমাইট) জাতীয় চুন প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরের পানির পিএইচ ৮.৫ এর বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে এবং পরিবর্তনের পরপরই চুন প্রয়োগ করতে হবে। মূল কথা প্রতিবার পুকুরের পানি পরিবর্তন অথবা অতিবৃষ্টির পরপরই পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

২.১৬ সার প্রয়োগ

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও মাছের খাদ্য তৈরিতে সহায়তা করার জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ তাদের আমিষ চাহিদার ৪০-৭০% পূরণ করতে পারে। কার্প জাতীয় মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য হচ্ছে প্লাংকটণ। প্লাংকটণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, পুকুরের তলার কীট প্রভৃতি মাছের প্রিয় খাদ্য। এসকল প্লাংকটণ ও জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য পুকুরে বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিকারক উপাদান সরবরাহ করতে হয়।

পুষ্টিকারক উপাদানসমুহের মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব পদার্থ বাজারে সরাসরি পাওয়া যায় না। তবে বাণিজ্যিক ভাবে দু'ধরণের যৌগাকারে সার হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন- জৈব সার ও অজৈব বা রাসায়নিক সার। জীবদেহ হতে প্রাপ্ত সারকে জৈব সার বলে। যেমন- গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতি। সুনির্দিষ্ট উপাদান সমৃদ্ধ যেসব সার কৃত্রিম উপায়ে কারখানাতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে তাদেরকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ ইত্যাদি। পুকুরে সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্ন লিখিত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীলঃ

- মাটির অবস্থা,
- পানির মধ্যকার শেওলার পুষ্টি চাহিদা,
- পরিবেশের ভারসাম্য,
- সারের গুণাগুণ, এবং
- মাছের ঘনত্ব।

সার প্রয়োগের উপকারীতা: পুকুরে সার প্রয়োগ করলে নিম্ন লিখিত উপকার পাওয়া যায়।

- সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুকুরের পানিতে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হয়। এসব পুষ্টি উপাদানসমুহ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে,
- পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়,
- সম্পূরক খাদ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়,
- জৈব সার বিশেষ করে গোবরে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। পুকুরে ব্যবহার করলে এ আঁশ ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া জৈবসার রুই ও তেলাপিয়া মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, এবং
- পরিশেষে অল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

২০২৫

২.১৬.১ বিভিন্ন ধরণের সার

২.১৬.১.১ জৈব সার

ক) **কম্পোস্ট সার:** মাটির গর্তে গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতির সাথে কচুরিপানা, কলমিলতা, ঝাঁঝি জাতীয় উদ্ভিদ নানা ধরনের শেওলা রেখে দিলে পচন ক্রিয়ার ফলে যে মিশ্র সার তৈরি হয় তাকে কম্পাস্টে সার বলে। মাছ চাষে কম্পোস্ট সারের ব্যবহার করা যায়। তবে একসাথে বেশি পরিমাণ কম্পোস্ট সার পুকুরে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। কারণ এতে অক্সিজেন এর ঘাটতির আশঙ্কা থাকে।

খ) **খৈলজাতীয় সার:** সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিসির খৈল, তিলের খৈল প্রভৃতি শস্যবীজের খৈল পুকুরে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত সরিষার খৈল জৈব সার হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরিষার খৈলে সাধারণত ৪.৭% নাইট্রোজেন, ২.৫% ফসফরাস ও ১.০% পটাসিয়াম থাকে।

২.১৬.১.২ অজৈব সার

কলকারখানায় কৃত্রিম উপায়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে অজৈব বা রাসায়নিক সার বলে। যথা- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি ইত্যাদি। এই রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পুকুরে নানা ধরনের উদ্ভিদ কণা বা ফাইটোপ্লাংকটণ জন্মায় ও পুকুরের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

ক) **নাইট্রোজেনজাতীয় সার:** নাইট্রোজেনজাতীয় সার বাজারে ইউরিয়া হিসেবে পাওয়া যায়। এই সার অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে পুকুরে নাইট্রোজেনের ঘাটতি দূর হয় ও পুকুরের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। এবং পানিতে দ্রবীভূত হতে সময় কম লাগে।

খ) **ফসফেট জাতীয় সার:** ফসফরাসজাতীয় সার বাজারে সিঙ্গেল সুপার ফসফেট (এসএসপি), ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি), রক ফসফেট প্রভৃতি হিসেবে পাওয়া যায়। এই সার অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করলে পুকুরে ফসফেটের ঘাটতি দূর হয় ও পুকুরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই সার দেখতে ছাই রঙের এবং পানিতে দ্রবীভূত হতে একটু সময় লাগে। এজন্য ফসফেট জাতীয় সার পানিতে গুলিয়ে তারপরে পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়।

গ) **পটাশজাতীয়** সার: পটাশজাতীয় সার হিসেবে পটাসিয়াম অক্সাইড, পটাসিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি বাজারে পাওয়া যায়। এসব সারের মধ্যে পটাসিয়াম অক্সাইড বা মিউরেট অব পটাশ (এমপি) সার পুকুর প্রস্তুতকালে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এই সার দেখতে দানাদার এবং লাল রঙের।

ঘ) অন্যান্য **রাসায়নিক উপাদান** : কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদান যেমন-জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, লোহা, বোরন, মলিবডেনাম, আয়োডিন প্রভৃতি মাটিতে খুব অল্প মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। এদের যে কোনো একটির অভাব দেখা দিলে মাটি তথা পুকুরের উর্বরতা শক্তি কমে যায়। পুকুরে উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা উৎপাদনে এসব ট্রেস উপাদান এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সার প্রয়োগের মাত্রা: স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতকালীন এবং মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

পুকুর প্রস্তুতকালীন সার প্রয়োগ		মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ		
সারের নাম	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ
	প্রতি শতাংশে	শতাংশ/দিন	শতাংশ/সপ্তাহ	বিঘা/দিন
কম্পোষ্ট	১০ কেজি	২০০ গ্রাম	১.৫ কেজি	৭ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ গ্রাম	৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৭৫ গ্রাম	৩ গ্রাম	২১ গ্রাম	১০০ গ্রাম



চিত্র ২.১৪: বিভিন্ন প্রকারের সার

সার প্রয়োগে সতর্কতা:

- পুকুরে আগাছা থাকলে সারের কার্যকারীতা কমে যায়,
- পুকুরে পানির স্থায়িত্ব কম হলেও সারের কার্যকারীতা কমে যাবে,
- মেঘলা দিনে অথবা বৃষ্টির মধ্যে সারের ব্যবহার খুব কার্যকর নয়,ও
- চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করা উচিত।

২০২৬

২.১৭ পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

সার দেওয়ার ৫-৭ দিন পরে পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে হয়। যদি হালকা সবুজ কিংবা বাদামী সবুজ হয় তবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাবার তৈরী হয়েছে এবং এখন মাছ ছাড়ার উপযোগী হয়েছে। পুকুরের প্রাকৃতিক খাবার বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করা যায়- (ক) সেকি ডিস্কের মাধ্যমে ও (খ) হাত দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমে।

সূর্যালোকিত ও বৃষ্টিমুক্ত দিনের বেলায় সকাল ১০-১২ টার মধ্যে পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করতে হবে। হাত কনুই পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে হাতের তালু দেখুন, যদি তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পানিতে খাবার আছে। আর যদি তালু দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে পানিতে পর্যাপ্ত খাবার নেই এবং খাবারের জন্য সার প্রয়োগ করতে হবে। এ ছাড়াও স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায়। গ্লাসের মধ্যে পুকুরের পানি নিয়ে যদি ৮-১০ টা প্রাণিকণা দেখা যায় তবে বুঝা যাবে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার আছে। এর চেয়ে কম সংখ্যক দেখা দিলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার কম আছে এবং সার প্রয়োগ করতে হবে।

২.১৮ পুকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

লাভজনক চিংড়ি চাষের পূর্বশর্ত হচ্ছে পুকুরে সুস্থ ও সবল পোনা মজুদ করা। সুতরাং গলদার ভাল উৎপাদন পেতে হলে পোনা মজুদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা প্রয়োজন। গলদা চিংড়ির পোনা মজুদের ক্ষেত্রে পোনা শনাক্তকরণ, পোনা সংগ্রহ ও পরিবহন পদ্ধতি, মজুদ হার নির্ধারণ ও মজুদ করার নিয়ম সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত।

২.১৮.১ পোনা শনাক্তকরণ: প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত গলদা চিংড়ির পোনা অন্যান্য চিংড়ির পোনা থেকে পৃথক করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গলদা চিংড়ির রোস্ট্রামের উপরের দিকে ১২-২৫টি এবং নিচের দিকে ৮-১৪ টি খাঁজ থাকে। মাথার ক্যারাপেস অঞ্চলের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি দাগ থাকে। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা চিংড়ির পোনা চেনার আরেকটি উপায় হচ্ছে গলদা চিংড়ির রেণু স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে থাকে এবং কখনও কখনও চিৎ হয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। এই রেণু পোনার পিঠে কালো দাগ থাকে। সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায় হলো-

- সুস্থ ও সবল পোস্ট লার্ভার রং সাধারণত হালকা বাদামি বা স্বচ্ছ হয়ে থাকে। তবে দুর্বল ও পীড়িত পোনার রং লালচে বা নীল বর্ণের হয়ে থাকে।
- সুস্থ ও সবল পোনা সক্রিয়ভাবে সাঁতার কাটতে পারে। এসব পোনা পাত্রের ছায়াযুক্ত স্থান ও ট্যাপের পানির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। রোগাক্রান্ত পোনা পাত্রের মধ্যে সাধারণত সক্রিয় থাকে না এবং পাত্রের মাঝখানে জমাট বেঁধে থাকে।
- একটি প্লাস্টিক গামলা বা অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের পানিসহ পোনা রেখে হাত দিয়ে পানিতে ঘূর্ণন সৃষ্টি করলে যদি পোনা পাত্রের মাঝখানে জমা হয় তবে বুঝতে হবে পোনা দুর্বল।
- পোনা রাখা পাত্রের গায়ে টোকা দিলে সবল পোনা খুব দ্রুত সরে পড়ে এবং অনেক সময় লাফ দিয়ে পাত্রের বাইরে পড়ে যায়। ২০২৩

- সুস্থ ও সবল পোনা নিয়মিতভাবে খোলস পাল্টায় ফলে গাত্রবর্ণ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখায়।
- সবল পোনার পেটে খাদ্য দৃশ্যমান হয়।
- দুর্বল পোনা নোংরা থাকে এবং মাঝে মধ্যে কালো দেখা যায়।

২.১৮.২ গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন: প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি থেকে সংগৃহীত পিএল সরাসরি পুকুরে মজুদ করা উচিত নয়। চিংড়ির পোনা সরাসরি উৎপাদন পুকুরে মজুদ করলে পোনার মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যায় এবং সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এজন্য নার্সারিতে গলদা চিংড়ির পোনা প্রতিপালন করে কিশোর চিংড়ি বা বড় পোনা পুকুরে মজুদ করলে চিংড়ির সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

চিংড়ি পোনা সাধারণত পরিবেশের সামান্য তারতম্যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবহন জনিত পীড়নের ফলে চিংড়ি পোনা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শ্বাসকষ্টে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সব অসুস্থ দুর্বল পোনা সরাসরি মজুদ পুকুরে ছাড়া হলে সাধারণত অধিকাংশ পোনা মারা যায়। মজুদ পুকুরে চিংড়ির উৎপাদন নিশ্চিত করতে নার্সারিতে পোনা প্রতিপালনের উপকারিতা নিম্নরূপ-

- নতুন পরিবেশের সাথে পোনা সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে,
- পোনার মৃত্যুর হার কমানো যায়,
- পরিবেশের তারতম্যের কারণে সৃষ্ট পীড়ন বা শ্বাসকষ্ট রোধ করা যায়,
- অল্প সময়ে পোনাকে সবল ও বড় করা যায়,
- ক্ষতিকর ও রাক্ষুসে প্রাণির আক্রমণ থেকে পোনাকে রক্ষা করা যায়,
- অন্যান্য ছোট প্রজাতির চিংড়ি থেকে গলদা চিংড়ির পোনা সহজেই বাছাই করা যায়,
- পোনার বেঁচে থাকার হার সহজেই অনুমান করা যায় ও
- মজুদ পুকুরের উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

নার্সারি পুকুর: খামারের মোট আয়তনের সাধারণত ১০-১৫% এলাকায় নার্সারি পুকুর করা উচিত। সাধারণত মজুদ পুকুরের মধ্যে বাঁধ দিয়ে অথবা ঘন জালের বেড়া দিয়ে ছোট আকারের নার্সারি পুকুর তৈরি করা যায়। নার্সারি পুকুর অপেক্ষাকৃত ছোট হলে ভালো হয়। নার্সারি পুকুরের আয়তন ২-৩ বিঘা হলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি, এঁটেল দো-আঁশ কিংবা বেলে দো-আঁশ মাটি নার্সারি পুকুর নির্মাণের জন্য সবচেয়ে ভালো। অ্যাসিড সালফেট যুক্ত কিংবা বেলেযুক্ত মাটি নার্সারি পুকুর নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। পাড়ের উচ্চতা বন্যামুক্ত হতে হবে এবং পাড়ের ঢাল ২:১ অথবা ৩:১ এর মধ্যে রাখতে হবে। পুকুরের গভীরতা বর্ষাকালে ৯০-১০০ সেমি এবং শুকনা মৌসুমে ৭০-৮০ সেমি হলে ভালো হয়। পুকুরের তলদেশ সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নার্সারি পুকুরের পানির গুণাবলি: পুকুর প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিংড়ির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। চিংড়ি সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে প্ল্যাংকটন, ছোট পোকা-মাকড় ও পচা জৈব পদার্থ খেয়ে বড় হয়। এ সব অণুজীব ও ছোট প্রাণী পানিতে একটি বিশেষ পরিবেশে জন্মায়। এই উপযুক্ত পরিবেশের জন্য পানিতে নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

পানির গুণাগুণ	মাত্রা
তাপমাত্রা	২৫-৩০° সেমি
অক্সিজেন	৫.০-৮.৫ পিপিএম
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
পানির স্বচ্ছতা	২৫-৩৫ সেমি

নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির নিয়মাবলি: পোনা মজুদের পূর্বে পুকুর প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

- সমস্ত জলজ আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত প্রাণী দমন করতে হবে।
- পুকুরের পুরাতন পানি নিষ্কাশন করে পুকুরের তলদেশ ৬-৭ দিন রোদে শুকাতে হবে।
- পুকুরের পাড় ভালোভাবে মেরামত করতে হবে এবং পাড়ে কোনো গর্ত থাকলে তা ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে।
- পুকুরের তলদেশে হালকা চাষ দিতে হবে।
- চাষ দেওয়ার পর প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পুকুরে চিংড়ির পোনার আবাসস্থলের উন্নয়ন করতে হবে। আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যে পুকুরের তলায় বাঁশের কঞ্চি বা নারকেল গাছের ডাল কাত করে পুঁতে দিতে হবে। চিংড়ির পোনা ছোট অবস্থায় ডালপালার সাথে আকড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া গাছের ডালপালা খাদ্য যোগাতে সহায়তা করে থাকে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর নির্ধারিত হারে পোনামজুদ করতে হবে। নার্সারি পুকুরে ৭০-৯০ সেমি পানি রাখতে হয়।

পোনা মজুদের হার: চিংড়ি খামারের মাটির উর্বরতা, পানির গুণাগুণ, সম্পূরক খাবার প্রয়োগ ও পানির ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে পুকুরে পোনামজুদের হার নির্ধারণ করা হয়। চাষ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পোনা মজুদের হার নিচে বর্ণনা করা হলো-

চাষ পদ্ধতি	প্রতি শতাংশে পোনা মজুদের হার
প্রচলিত চাষ পদ্ধতি	১০,০০০-৩০,০০০ টি
সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতি	৪০,০০০-৮০,০০০ টি
আধা নিবিড় চাষ পদ্ধতি	৯০,০০০-১,৫০,০০০ টি

২০২৫

নার্সারি পুকুরে খাবার সরবরাহ: প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি পোনা মজুদের প্রথম সপ্তাহে পুকুরে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করা উচিত। কারণ এই সম্পূরক খাবার চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তবে কোনাক্রমেই পুকুরে যাতে অতিরিক্ত খাবার সরবরাহ করা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ অতিরিক্ত খাবারের পচন ক্রিয়ার ফলে পানি দূষিত হয়ে পড়ে এবং পীড়ন ও অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে পোনা অতি অল্প সময়ে মারা যায়। চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, মাছের চূর্ণ, ছোট আকারের চিংড়ির শুটকি, ছোট প্রজাতির মাছ, জীবের রক্ত, সরিষার খৈল, সয়াবিনের খৈল, ভিটামিন ইত্যাদি একত্রে মিশিয়ে চিংড়ির সম্পূরক খাবার তৈরি করা যায়।

খাবার পিলেট, সেমাই অথবা মন্ড তৈরি করে পুকুরে প্রয়োগ করলে খাবারের অপচয় কম হয় এবং খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফিডিং ট্রে বা অন্য যে কোনো পাত্রের মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্য প্রয়োগের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সহজ হয়। চিংড়ি যদিও সর্বভুক প্রাণী তথাপি এরা প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে। চিংড়ির খাদ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান থাকা আবশ্যক:

উপাদানের নাম	শতকরা পরিমাণ
আমিষ	৩০-৪০ ভাগ
স্নেহ/চর্বি	৫-৭ ভাগ
শর্করা	৩০-৩৫ ভাগ
ভিটামিন/মিনারেলস	১-২ ভাগ।

খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ: ১ বিঘা বা ৩৩ শতাংশের একটি নার্সারি পুকুরে ৩৩,০০০-৩৫,০০০ পোনা (পিএল ১২-১৫) মজুদ করা যায়। পোনা মজুদের ১ম সপ্তাহে নিম্নবর্ণিত হারে সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।

লালনকাল	প্রতিদিন
১ম সপ্তাহে	৪০০ গ্রাম
২য় সপ্তাহে	৮০০ গ্রাম
৩য় সপ্তাহে	১,০০০ গ্রাম
৪র্থ সপ্তাহে	১,৩০০ গ্রাম

এক মাসের পোনার নমুনা সংগ্রহ করে মোট ওজনের শতকারা ৪-৫ ভাগ হিসেবে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
মোট পোনার পরিমাণ বেঁচে থাকার হার (৭৫%) – ২৪,৭৫০ টি (প্রায়)

প্রতিটির গড় ওজন	১.৭৫ গ্রাম (প্রায়)
মোট পোনার ওজন	৪৫ কেজি (প্রায়)
পোনার মোট ওজনের	৪-৫% হিসেবে প্রতিদিন
খাদ্যের প্রয়োজন	২.২৫ কেজি

২০২৫

এভাবে সপ্তাহভিত্তিক খাবার সরবরাহের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

লালনকাল	প্রতিদিন
৫ম সপ্তাহে	২.৫ কেজি
৬ষ্ঠ সপ্তাহে	৩.৬০ কেজি
৭ম সপ্তাহে	৪.৮০ কেজি
৮ম সপ্তাহে	৬.০০ কেজি

এভাবে ১ বিঘার নার্সারি পুকুরে ৩৩-৩৫ হাজার পোনা ছেড়ে ৬০ দিন লালন করতে প্রায় ১৪০ কেজি সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই দুই মাস প্রতি পালনের পর পোনা বিক্রয় যোগ্য হয় অথবা মজুদ পুকুরে ছাড়ার উপযুক্ত হয়। নার্সারি পুকুরে পোনা প্রতিপালনের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত দরকার।

- ক্ষতিকর ও রাক্ষুসে প্রাণির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা,
- পানির গভীরতা ঠিক রাখা,
- নিয়মিতভাবে পানির গুণগতমান পরীক্ষা করা,
- নিয়মিতভাবে পোনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা,
- প্রয়োজনে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা,
- বিভিন্ন প্রাণী কর্তৃক পুকুরের পাড়ে সৃষ্ট গর্ত তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা,
- গ্রীষ্মকালে পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা ও
- পোনা যাতে চুরি না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখা।

২.১৯ গলদা পোনা পরিবহন ও পোনা মজুদকরণ

বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির পোনা সরবরাহের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস। প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ করেই গলদা চিংড়ি পোনার চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা হয়। পোনা আহরণ স্থল থেকে পুকুরে মজুদ করা পর্যন্ত প্রায় ৫০% পোনা মারা যায় বলে অনুমান করা হয়। চিংড়ি পোনার পরিবহন পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে চললে পোনা এ মৃত্যুর হার বহুলাংশে কমানো সম্ভব। অনেক পোনা এক সাথে হ্যাচারি কিংবা প্রাকৃতিক উৎস থেকে দূর-দূরান্তে পরিবহনের জন্য পোনার সুষ্ঠু প্যাকিং একান্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠুভাবে প্যাকিং করে পানির তাপমাত্রা ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তাই পোনার প্যাকিং সঠিকভাবে করা না হলে অধিকাংশ পোনা পরিবহন কালে মারা যেতে পারে। বাংলাদেশে সাধারণত দুইভাবে পোনা পরিবহন করা যায়-

২.১৯.১ আধুনিক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পোনা পরিবহন করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে গলদা পোনা পরিবহন: আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে চিংড়ির পিএল এবং সনাতন পদ্ধতিতে ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে গলদা চিংড়ির পোনা পরিবহন করা হয়ে থাকে। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতে চারা পোনা ও জুভেনাইল পরিবহন অধিক নিরাপদ। সনাতন পদ্ধতিতে পরিবহনকালে ড্রাম বা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ির গায়ে ধাক্কা লেগে পোনার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং পাত্রের পানিতে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, এমন কি ব্যাপক হারে পোনা মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকালে অক্সিজেনের অভাব হয় না ও পোনার শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

অক্সিজেনসহ পলিথিন ব্যাগে লিটার প্রতি ৫০০টি হারে ছোট পোনা পরিবহন করা যায়। একটি ৬০ x ৪০ সে. মিটার ব্যাগের ৬-৮ লিটার পানিতে অক্সিজেন দিয়ে ৩,০০০-৪,০০০ টি ১০-১৫ দিন বয়সের পোনা ১২ ঘণ্টার জন্য পরিবহন করা যায়।

পোনা পরিবহন ঘনত্ব: পরিবহন ঘনত্ব মুলত নির্ভর করে পিএল, জুভেনাইল ও চারা পোনার আকার, ওজন এবং পরিবহন দূরত্বের উপর । সাধারণভাবে ৩৬ ইঞ্চি x ২০ ইঞ্চি আকারের পলিথিন ব্যাগ পিএল বা পোনা পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। চিংড়ির পোনার আকার ও দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে পরিবহন ঘনত্ব নিম্নরূপ

পোনার আকার/ধরন	পরিবহন ঘনত্ব/লিটার	পরিবহন সময় (ঘণ্টা)	পরিবহন পদ্ধতি
পোস্ট লার্ভা-২০	৫০০-১০০০	১২-১৬ অক্সিজেনসহ	পলি ব্যাগ
পোস্ট লার্ভা-৩০-৩৫	৩৫০-৫০০	৬	ঐ
জুভেনাইল (৫-৭ সেমি)	১০-২০	৩-৬	ঐ

২.১৯.২ সনাতন পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে পোনা পরিবহন করা হয়।

২.২০ পোনা প্যাকিং পদ্ধতি

গলদা চিংড়ির পোনা অত্যন্ত কোমল, স্পর্শকাতর এবং খুব সহজেই পীড়িত হয়ে পড়ে বিধায় প্যাকিং-এর সময় এদেরকে খুব যত্ন সহকারে নড়াচড়া করতে হয়। নিচে পোনার প্যাকিং পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো।

- পোনা পরিবহনের কমপক্ষে ২ ঘণ্টা পূর্বে পোনাকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।
- এরপর পোনা একই লবণাক্ততা ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট পরিস্কার পানিতে রাখতে হবে।
- একটি পলিথিন ব্যাগ একই আকারের আরেকটি পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্যাগের নিচের দুই কোণা রাবারের ব্যান্ড দিয়ে মুড়িয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগের এক তৃতীয়াংশ ৮-১০ লিটার একই পরিবেশের পানি দ্বারা পুর্ণ করতে হবে। এরপর পরিবহনের দূরত্ব ও পোনার আকার অনুযায়ী ১,০০০-৫,০০০ পোনা গণনা করে ব্যাগের মধ্যে

রাখতে হবে। ব্যাগের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ণ করে ব্যাগের মুখ ভালোভাবে মুড়িয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

- পরিবহনকালে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ২২° সে. এর কাছাকাছি রাখতে হবে। প্রয়োজনে প্রতি ১০ লিটার পানিতে প্রতি ঘণ্টার পরিবহন দূরত্বের জন্য ১০০ গ্রাম বরফ পলিথিন ব্যাগে করে পরিবহন পাত্রের ভিতর রাখতে হবে।

২.২১ পোনা পরিবহন পদ্ধতি

প্যাকিংসহ অথবা প্যাকিং ছাড়া পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। কম দূরত্বে অথবা সময় কম লাগলে মুখ খুলে পাত্রে সীমিত পরিমাণ পোনা মাথায় বা গাড়িতে করে খামার পর্যন্ত পরিবহন করা যায়। পানিতে বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার জন্য পরিবহন কালে পাত্রটি ঝাঁকুনি দেয়া ভালো। গাড়ির চলার পথেও ঝাঁকুনিতে অক্সিজেন সরবরাহের কাজ হয়।

পানির ট্যাংকে পোনা পরিবহন: এই পদ্ধতিতে একসাথে অনেক বেশি পোনা সহজে পরিবহন করা সম্ভব। পোনা পরিবহনের জন্য ফাইবার গ্লাস মেটারিয়ালের সাহায্যে হাইড্রোট্যাংক নির্মাণ করা যায়। ব্যাটারি চালিত এ্যারেটর বা প্রেসার ট্যাংক থেকে হাইড্রোট্যাংকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

২.২২ পোনা মজুদ পদ্ধতি

দূর-দূরান্ত থেকে পরিবহনকৃত পোনা সরাসরি খামারে মজুদ করা উচিত নয়। পরিবহনকৃত পোনা সরাসরি মজুদ করলে পোনার ব্যাপক মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে। ফলে চিংড়ির উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এজন্য খামারে পোনা মজুদ করার পূর্বে পরিবহনকৃত পোনা পুকুরের পানির লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পরিবহনের পর স্টাইরোফোম বক্স থেকে পলিথিন ব্যাগে করে নিয়ে পুকুরের পানিতে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে যাতে পলিথিন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার সমতা আসে। পলিথিন ব্যাগ ৩০ মিনিট পানিতে ভাসিয়ে রাখার পর ব্যাগের মুখ খুলে থার্মোমিটার দিয়ে ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা মেপে নিতে হবে।

২.২২.১ পোনা খাপ খাওয়ানো এবং মজুদকরণ

পুকুরে ছাড়ার আগে এদেরকে নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করে নিলে মৃত্যুহার অনেকাংশে রোধ করা যায়। পরিবহন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রায় সমতা আনয়নই হচ্ছে অভ্যস্তকরণ। নতুন পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত করে পুকুরে পোনা বা পিএল বা জুভেনাইল ছাড়ার ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নরূপ-

- পরিবহন পাত্র অন্তত ১৫-২০ মিনিট পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- ব্যাগ বা পাত্রের মুখ খোলার পর আস্তে আস্তে পাত্র ও পুকুরের পানি অদল বদল করে পানির তাপমাত্রায় সমতায় আনতে হবে

২০২৫

- হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পরিবহন পাত্র এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রার ব্যবধান পরীক্ষা করতে হবে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ১-২ ডিগ্রি সে. এর বেশি না হয়।
- উভয় পানির তাপমাত্রা সমান হলে পাত্রের মুখ কাত করে ধরে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে স্রোতের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোনো সময়ে পুকুরে চিংড়ির পোনা ছাড়া যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা ছাড়াই উত্তম।



চিত্র ২.১৫: গলদা পোনা খাপ খাওয়ানো ও অবমুক্তকরণ

২.২২.২ পুকুরে গলদা চিংড়ি পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর পুকুরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের পূর্বশর্ত। পোনা মজুদ পরবর্তী সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ছাড়া চিংড়ির কাংক্ষিত উৎপাদন সম্ভব নয়। পোনা মজুদের পর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বিষয়গুলো হচ্ছে:

২.২২.২.১ পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ: পোনা ছাড়ার ৬-৮ ঘণ্টা পর পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুর্বল পোনা পাড়ের কাছাকাছি এলোমেলোভাবে সাঁতার কাটতে দেখা যায়। তাছাড়া পোনা মারা গেছে কিনা তা দেখতে হবে। মৃত পোনা পুকুর পাড়ের খুব কাছাকাছি ভাসতে থাকে। মৃত পোনার পরিমাণ নির্ধারণ করে সেই পরিমাণ পোনা পুনরায় মজুদ করতে হবে।

২.২২.২.২ পানি ব্যবস্থাপনা: পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা চিংড়ি চাষের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। সাধারণত পানি ব্যবস্থাপনা তথা পানির গুণাগুণ বজায় রাখার প্রধান কারণ হচ্ছে চিংড়ির বেঁচে থাকার হার বাড়ানো এবং দৈহিক বৃদ্ধি। পুকুরের পানির ভালো অবস্থা বলতে সাধারণত পানিতে পরিমিত

অক্সিজেন ও অতিরিক্ত বর্জ্যের (Metabolistic) পুঞ্জীভূত হওয়াকে বুঝায়। পানির গুণগতমান বজায় রাখার উত্তম পদ্ধতি হলো নিয়মিতভাবে পুকুরের পানি পরিবর্তন করা। এর ফলে পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ বজায় থাকে, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত শেওলা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং নতুন পানির সাথে নতুন পুষ্টিকর পদার্থসমূহ পুকুরে সঞ্চালিত হয়।

চিংড়ি পোনা মজুদের পর এক সপ্তাহ কোন পানি পরিবর্তন করার প্রয়াজেন হয় না। তবে প্রথম মাসে অমাবস্যা, পূর্ণিমার সময় একবার বা দুইবার পানি পরিবর্তন করা ভাল। চিংড়ি চাষের পুরো সময়ে পোনা মজুদের ঘনত্ব, পানির গুণগতমান, লবণাক্ততা, প্লাংকটণের ঘনত্ব, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পিএইচ, রোগের প্রাদুর্ভাব, খাদ্য প্রয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পানি পরিবর্তনের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করে। সাধারণত প্রত্যেকবার পানি পরিবর্তন করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ মাসে ৩-৫ দিন অন্তর পানি পরিবর্তন করা ভাল। অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারে প্রতিদিন ১০% পানি পরিবর্তন করা হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে প্রতিদিনই ৩০% পানি Flow through পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়।

প্রচলিত চাষ পদ্ধতিতে ভাটার সময় প্রয়োজনে পুকুরের অর্ধেক পানি বের করে দিয়ে জোয়ারের সময় পানি ঢুকানো হয়। সাধারণত জোয়ার ভাটার ওপর নির্ভর করে মাত্র ৫-৬ দিনে ৫০-১০০% পানি পরিবর্তন করা সম্ভব। আধা নিবিড় বা নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে পানি পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকমের পাম্প ব্যবহার করা হয় এবং জোয়ারের পানির ওপর কম নির্ভর করা হয়। আধানিবিড় চাষ পদ্ধতিতে জোয়ারের সময় স্বাভাবিকভাবে পানি পরিবর্তন করা হয়, তবে ভাটার সময় প্রয়োজনে পাম্প ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পানি দুইভাবে পরিবর্তন করা যায়। প্রথম পদ্ধতিতে প্রয়োজন মতো কিছুটা পানি বের করে দেয়া হয় এবং পরে সেই পরিমাণ পানি ঢুকানো হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একদিক দিয়ে পানি প্রবেশ এবং অপর দিক দিয়ে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এভাবে পানি পরিবর্তন করার পদ্ধতিকে Flow through system বলা হয়।

অধিক বৃষ্টিপাতের সময় পানি পরিবর্তন না করে পানি নিস্কাশন গেটের মুখে ঘনজাল স্থাপন করে পুকুরের উপরের স্তরের পানি বের করে দেয়া উত্তম। এতে লবণাক্ততা হ্রাসের ঝুঁকি কমে যায়।

২.২২.২.৩ পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ: পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য প্রধানত তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির লবণাক্ততা, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, খরতা ও ক্ষারত্ব, পিএইচ, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। গলদা চাষের পুকুরের পানির সহনীয় গুণাবলীগুলো নিম্নরূপ:

গুনাগুণ	পরিমিত মাত্রা
তাপমাত্রা	২৬-৩০° সে.
দ্রবীভূত অক্সিজেন	৪ পিপিএম এর বেশি
পিএইচ	৭.৫-৮.৫
লবণাক্ততা	০-৪.০ পিপিটি
সম্পূর্ণ হার্ডনেস	১০০ পিপিএম এর কম
লৌহ	১.০ পিপিএম এর কম

২০২৫

হাইড্রোজেন সালফাইড	০.০৩ পিপিএম এর কম
অনায়োনিত অ্যামোনিয়া	০.১ পিপিএম এর কম।
নাইট্রাইট (NO_2)	০.১ পিপিএম এর কম।
নাইট্রেট (NO_3)	২০ পিপিএম এর কম।

২.২২.২.৪. সার প্রয়াগ: সম্প্রসারিত পদ্ধতির চাষাবাদে সার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেয়া হয়। পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটণ উৎপাদিত হয়। সেকি ডিস্কের দৃশ্যমানতা ৩০-৩৫ সেমি এর বেশি হলেই সার প্রয়োগ করা উচিত। পুকুরের পানিতে সেকি ডিস্কের দৃশ্যমানতার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত সম্প্রসারিত পদ্ধতির চাষাবাদে শতাংশ প্রতি ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০-৩০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই মাত্রায় সার প্রয়োগের ৫-৬ দিনের মধ্যে সেকি ডিস্কের দৃশ্যমানতা না কমলে উপরোক্ত মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ সার আবার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর অর্থাৎ প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় পানি পরিবর্তনের পর সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আধানিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির চাষে প্রথম ২ মাস প্রতিবার পানি পরিবর্তনের পর অল্প মাত্রায় ইউরিয়া ও টিএসপি সার প্রয়োগ করা ভাল।

২.২২.২.৫ খাদ্য ব্যবস্থাপনা: চিংড়ির জীবনধারণ, দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। উন্নত ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছু সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধানিবিড় ও নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদ মূলত সম্পূরক খাদ্য বা পিলেটের উপর নির্ভরশীল। চিংড়ি খামারে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করলে অব্যবহৃত খাদ্য পচে পানি দূষিত করে ফেলে। এতে পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। চিংড়ির গড় ওজন ও তাপমাত্রার ওপর চিংড়ির খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের হার কমানো উচিত। চিংড়ির গড় ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগের হার নিচে দেয়া হলো:

	চিংড়ির গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের হার (মোট দৈনিক ওজনের %)
নার্সারি পুকুর / পালন পুকুর	০.২-১.০	১৫-১৩
	১.০-২.০	১৩-১১
	২.০-৩.০	১১-৯
	৩.০-৫.০	৯-৭
	৫.০-১৩.০	৭-৫
	১৩.০-২০.০	৫-৩
	২০.০-৩০.০	৩-২.৫

খাদ্য দাণির মাধ্যমে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগ করলে খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং সঠিকভাবে খাদ্যের মাত্রা নির্ণয় করা যায়। গলদা চিংড়ি দিন-রাত সব সময় খাদ্য খেয়ে থাকে তবে সন্ধ্যা ও রাতে চিংড়ি সবচেয়ে বেশি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। সূর্যালোকের প্রখরতা বাড়ার সাথে সাথে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা আপেক্ষিকভাবে কমে যায়।

২.২২.২.৬ চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা: চিংড়ির স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য নিয়মিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করা দরকার। সাধারণত খেপলা জালের সাহায্যে এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা সংগ্রহের পর চিংড়ির স্বাস্থ্য ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখার দরকার যে চিংড়ি রোগাক্রান্ত হয়েছে কিনা। যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে জরুরি ভিত্তিতে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নমুনা সংগ্রহের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে চিংড়ির সংখ্যা ও গড় ওজন হিসাব করে বের করা। কারণ চিংড়ির গড় ওজনের ভিত্তিতেই খামারে খাদ্য প্রয়াগ করা হয়।

২.২২.২.৭ খামার চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা: সাধারণত অস্বাস্থ্যকর জলীয় পরিবেশ, মজুদ ঘনত্ব বেশি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি কারণে চিংড়ির শরীরে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য চিংড়ির স্বাস্থ্য রক্ষায় পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। চিংড়ির ঘনত্ব বেশি হলে খাদ্যাভাবও প্রকট হয়। তাছাড়া অধিক ঘনত্বের কারণে জলীয় পরিবেশও দূষিত হয়ে পড়ে। চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো- পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নির্ধারিত মজুদ ঘনত্ব বজায় রাখা, অনাকাঙ্খিত প্রাণির অনুপ্রবেশ রোধ, খামারে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও আহরণ সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত রাখা। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুরে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে একান্তভাবেই যদি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে এর ব্যবহারের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখতে হবে।

২.২২.২.৮ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ: সঠিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পানি সরবরাহ ও নির্গমন ব্যবস্থা যাতে ঠিকমত থাকে সেজন্য পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন গেট নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। গেটের পার্শ্বে বা তলা দিয়ে পানি চলাচল করলে তা সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। অবাঞ্ছিত প্রাণী নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত নেট নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে এবং গেটের মুখে স্থাপিত পাটা ঠিকমত আছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে। বাঁধে কোন প্রকার ত্রুটি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে হবে। খামারের অবকাঠামোসমূহ সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

২.২৩ চাষকালীন উদ্ভূত সমস্যা ও তার প্রতিকার

সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক এবং লাভজনক উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভালো ব্যবস্থাপনার পরও চাষকালীন সময়ে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে বেশ কিছু কারিগরি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ফলে ব্যাপক হারে চিংড়ি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। নিচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরের এরূপ কিছু সাধারণ কারিগরি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছের প্রবেশ: পুকুর শুকানো অথবা বিষ প্রয়োগ করার পরও অনেক সময় পুকুর বা ঘেরে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ থেকে যেতে পারে। এছাড়াও বর্ষাকালে পানির সাথে বা বাচ্চাদের দ্বারা যে কোন সময় বাইরে থেকে শোল, টাকি, কৈ, শিং, মাগুর, চান্দা, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ পুকুরে প্রবেশ করতে পারে। এতে ব্যাপকভাবে মাছ ও চিংড়ির উৎপাদন কমে যেতে পারে।

প্রতিকার: পাখি, জাল, বৃষ্টির পানির স্রোত বা মানুষের মাধ্যমে এরা প্রবেশ করে। তাই এ সমস্ত উৎস থেকে সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে। পুকুরে বা ঘেরে বাইরের পানি ঢুকতে দেয়ার সময় ছাঁকনির মাধ্যমে প্রবেশ করানো উচিত। প্রয়োজনে পুকুরের চারদিকে ৩০-৪০ সেমি উঁচু মশারী বা জালের বেড়া দেয়া।

খ) পানির উপর ঘন সবুজ স্তর: অতিরিক্ত শেওলার জন্য পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যায়। ফলে রাতের বেলায় পানিতে অক্সিজেন কমে যায় এবং দিনের বেলায় পিএইচ বেড়ে যায়। এ ছাড়া শেওলা মরার পর পুকুরের তলায় জমা হয় এবং পচে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছ ও চিংড়ি পানির উপরিতলে খাবি খায় এবং কখনও কখনও ব্যাপক হারে মারা যায়।

প্রতিকার: তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে পুকুরে বা ঘেরে অগভীর নলকূপের পরিষ্কার ঠান্ডা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। সে সাথে পুকুরে বা ঘেরে খাদ্য ও সার প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও কিছু সিলভার কার্পের পোনা ছেড়ে জৈবিকভাবে অতিরিক্ত উদ্ভিদকণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) পানির উপর লাল স্তর: অতিরিক্ত লৌহ অথবা লাল শেওলার জন্যে পানির উপর লালস্তর পড়তে পারে। ফলে সূর্য্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে পারে না। এজন্যে পুকুরে খাদ্য ও অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়।

প্রতিকার: ধানের খড় বা কলাপাতা পেঁচিয়ে দড়ি বানিয়ে পানির উপর থেকে টেনে তুলে ফেলা যায়।

ঘ) অ্যামোনিয়া পুঞ্জীভবন: উচ্চতর পিএইচ এ অ্যামোনিয়া চিংড়ির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। পুকুরে ফাইটোপ্লাংকটণ বেড়ে গেলে পানির পিএইচ দ্রুত বেড়ে যায়। ফলে ব্যাপক সংখ্যায় মাছ ও চিংড়ি মারা যায়। অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে রক্ত পরিবহনতন্ত্র দ্রুত আক্রান্ত হয়।

প্রতিকার: মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ রাখা, সম্ভব হলে ৩০-৫০% পানি বদল ও পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করা।

ঙ) খাবি খাওয়া: সাধারণত ভোর বেলার দিকে মাছ ও চিংড়ি পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে এটা ঘটে। অক্সিজেন স্বল্পতা যদি খুব বেশি ও দীর্ঘমেয়াদি হয় তবে মাছ ও চিংড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

প্রতিকার: প্রাথমিক অবস্থায় সাময়িকভাবে সার ও খাদ্য প্রয়াগে বন্ধ রেখে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে বা সাঁতার কেটে পানিতে অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়াতে হবে। বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ বা স্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে একই পুকুরের পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) রাক্ষুসে প্রাণির উপদ্রব: সাপ, ব্যাঙ, কাকড়া, উদ মাছ ও চিংড়ি খেয়ে উৎপাদন অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

ছ) অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ: প্রায় সব চাষিই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ করে। ফলে এসব খাদ্যের একটা বড় অংশ তলায় জমা হয়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। এতে মাছ ও চিংড়ি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

প্রতিকার: খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে খাদ্যের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য প্রয়োগ স্থানের মাটিতে জমে থাকা অতিরিক্ত কাদা অপসারণ করতে হবে।

জ) তলার কালো কাদা: অতিরিক্ত খাদ্য ও জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় জমা হয়ে তলার মাটি কালো দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে বিষাক্ত গ্যাস তলায় জমা হয়ে মাছ ও চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও চিংড়ির দেহ কালো হয়ে বাজার মূল্য হ্রাস করে।

প্রতিকার: চিংড়ি ছাড়ার পূর্বে তলার অতিরিক্ত কালো কাদা তুলে ফেলতে হবে। চাষকালীন সময়ে চিংড়ির মড়ক দেখা দিলে দ্রুত পানি বদল, মজুদ ঘনত্ব হ্রাস এবং সার ও খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।

ঞ) স্বজাতিভোজিতা: স্বভাবগত কারণে চিংড়ি স্বজাতিভুক প্রাণী। যখন এদের খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন এরা ছোট ও দুর্বল আকৃতির চিংড়ি গুলিকে ধরে খায়।

প্রতিকার: মজুদকালীন সময়ে পুকুরে সমান আকৃতির পিএল বা জুভেনাইল মজুদ করতে হবে। এছাড়াও নিয়মিত সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে পুকুরে খাদ্যের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

ট) বৃষ্টির পর ভেসে উঠা: পিএইচ কমে যাওয়ার ফলে এটা ঘটে থাকে। পিএইচ কমে গেলে ক্ষতিকর হাইড্রোজেন সালফাইডের বিষক্রিয়া বেড়ে যায়।

প্রতিকার: বৃষ্টির পরপরই পানির পিএইচ পরিমাপ করতে হবে। প্রতিবার ভারী বৃষ্টির পর শতাংশ প্রতি ৭৫-৮০ গ্রাম হারে পোড়া চুন/ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হবে।

ঠ) অমাবস্যা বা পুর্ণিমায় রাতে পাড়ে চলে আসা: অমাবস্যা বা পুর্ণিমার তিথিতে রাতের বেলায় চিংড়ি পাড়ের ওপর চলে আসতে পারে। ফলে শিয়াল বা অন্য কোনো নিশাচর রাক্ষুসে প্রাণী দ্বারা চিংড়ি আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার: অমাবস্যা ও পুর্ণিমার সময় অতিরিক্ত সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। তবে পুকুরের পানির পরিবেশ ভালো থাকলে এ অবস্থা দেখা যায় না। পাড়ে মশারীর জাল দিয়ে বেড়া দেয়া যেতে পারে।

২.২৪ গলদা চিংড়ি ও মাছের মিশ্র চাষ

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমন্বিত চিংড়ি চাষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমন্বিত চিংড়ি চাষ এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মিঠা পানির গলদা চিংড়ি বাংলাদেশের প্রায় সব বদ্ধ জলাশয়েই রুইজাতীয় মাছের সাথে চাষ করা সম্ভব। কার্প ও গলদার মিশ্র চাষ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সকল মিঠা পানির পুকুরেই করা হচ্ছে। গলদা চিংড়ির পোনার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে বাঁধ দেয়া নিচু ধানক্ষেত, অগভীর পুকুর, বাঁওড়ের অগভীর অংশ, রাস্তা ও রেললাইনের পাশের খাল, সেচ খাল, ইত্যাদি মিঠাপানির জলাশয়ে গলদা চিংড়ি কার্প জাতীয় মাছের সাথে চাষ করা যায়।

মিশ্র চাষের সুবিধা:

- পুকুরের সকল স্তরের খাদ্যের সদ্ব্যহার হয়।
- চিংড়ির দাম বেশি বিধায় আনুপাতিক লাভ বেশি।
- অগভীর পুকুর এবং মৌসুমী পুকুরেও চিংড়ি লাভজনকভাবে চাষ করা যায়।
- প্রয়োজন অনুসারে ধানক্ষেতে খাল কেটে এক মৌসুমে মাছ ও চিংড়ি এবং অন্য মৌসুমে ধান চাষ করা যায়।
- ৪-৫ মাসের মধ্যেই চিংড়ি বাজারজাত করা যায়।

সাধারণত দুই ধরনের পুকুরে কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ করা যায়। যথা- বাৎসরিক পুকুর ও ঘের। তবে মৌসুমী পুকুরেও মিশ্র চাষ করা সম্ভব।

২.২৪.১ বাৎসরিক পুকুর: সাধারণত যে কোনো ধরনের বাৎসরিক পুকুর অথবা কম গভীর পুকুরেই গলদা চিংড়ি ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ করা যায়। মিশ্র চাষের জন্য পুকুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১) পুকুরের আয়তন ২০-২৫ শতাংশ এবং বর্ষাকালে পানির গভীরতা ১.৫ - ২.০ মিটারের মধ্যে থাকা উচিত।

(২) পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুর্যালোকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পুকুরের পাড়ে যেন বড় গাছপালা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৩) পুকুর পাড়ের ঢাল ১ : ২ এবং তলদেশ সমান হতে হবে। পুকুরের তলায় ২০ সেমি এর বেশি পচা কাদা থাকা মিশ্র চাষের জন্য ভালো নয়।

(৪) পুকুরের পাড় মূল ভুমি থেকে কমপক্ষে ৩০ সেমি উঁচু থাকা ভালো। এর ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশ করতে পারবে না ।

(৫) মিশ্র চাষের জন্য দো-আঁশ মাটির পুকুর সবচেয়ে ভালো। এঁটেল মাটির পুকুরের পানি ঘোলা থাকে। ফলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা অত্যন্ত কম বিধায় চিংড়ি বা মিশ্র চাষের জন্য বেলে মাটির পুকুর ভালো নয়।

২.২৪.২ ঘের: ঘের বলতে এমন এক খন্ড জমিকে বুঝায় যার ভেতর খাল কেটে চারদিকে বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালে চিংড়ি ও কার্পের মিশ্র চাষ এবং শীতকালে ধান চাষ করা হয়। মিশ্র চাষের এসব খামারকে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘের বলা হয়। ভাল ঘেরের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

(১) ৫০-৬০ শতাংশ আয়তনের আয়তকার ঘের ব্যবস্থাপনার জন্য ভালো,

(২) ঘের ৪টি অংশে বিভক্ত, যথা-পাড়, বকচর, খাল ও সমতল ভূমি বা ধানচাষ এলাকা। পুকুরের মাটি আয়তনের ২৫-৩০% পাড়, ৫% বকচর, ২৫-৩০% খাল এবং ৩৫-৪৫% সমতল ভূমি বা ধান চাষ এলাকা থাকা উচিত। দো-আঁশ বা এঁটেল মাটি ঘেরের জন্য সবচেয়ে ভালো,

(৩) বন্যামুক্ত ও সূর্যালোকিত স্থান ঘেরের জন্য উত্তম,

(৪) এসব ঘেরে সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে চিংড়ি ও কার্পের পোনা মজুদ করা হয়ে থাকে এবং অক্টোবর/নভেম্বর মাস থেকে চিংড়ি ও মাছ আহরণ করা হয়। চাষকালে ঘেরের ভেতর মাটি ১.৫ মিটার পানি থাকা বিশেষ প্রয়োজন তবে ধানক্ষেতে ০.৫ মিটারের বেশি পানি থাকা উচিত নয়,

(৫) নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে ধানক্ষেত থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর ঘেরে ধান চাষ করা যায়। ঘেরের একই জমি থেকে চিংড়ি, মাছ ও ধান এবং পাড়ে শাকসবজি উৎপাদন করা যায়।

মিশ্র চাষে প্রজাতি নির্বাচনঃ গলদা ও কার্পের মিশ্র চাষে সব মাছই লাভজনক নয়। মিশ্র চাষে কার্পের প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- পুকুরে বসবাসযোগ্য এবং প্রাকৃতিক খাদ্য ব্যবহারে সক্ষম হতে হবে,
- মিশ্র চাষের জন্য নির্বাচিত প্রজাতিগুলো দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে,
- খাদ্য ও বাসস্থলের ব্যাপারে যেন প্রজাতিগুলো একে অপরের প্রতিযোগী না হয়,
- অরাক্ষুসে স্বভাবের এবং রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হতে হবে ও
- বাজারে চাহিদা থাকতে হবে এবং বাজার মূল্য ভালো হতে হবে।

এসব বিষয় বিবেচনায় মিশ্র চাষে চাষযোগ্য কার্প প্রজাতিগুলো হচ্ছে দেশি কার্প ও কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউশ/বাটা বিদেশি কার্প ও সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, বিগহেড কার্প, কার্পিও ও সরপুঁটি। মিশ্র চাষের উপযোগী বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস নিচে বর্ণনা করা হলো:

মাছ	প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য	খাদ্যাভ্যাস
কাতলা	প্লাংকটণ	উপর ও মধ্যস্তর
সিলভার কার্প	ফাইটোপ্লাংকটণ	উপরস্তর
গ্রাসকার্প	প্রধাণত জলজ উদ্ভিদ	উপরস্তর ও সর্বস্তর
বিগহেড	জুপ্লাংকটণ	উপরস্তর ও মধ্যস্তর
রুই	জুপ্লাংকটণ, পচা জৈব পদার্থ	উপরস্তর ও মধ্যস্তর
মৃগেল	জুপ্লাংকটণ, পচা জৈব পদার্থ, তলদেশের কীট	মধ্য ও নিম্নস্তর
কালিবাউশ	জুপ্লাংকটণ, পচা জৈব পদার্থ, তলদেশের কীট	নিম্নস্তর
মিরর কার্প/কার্পিও	জুপ্লাংকটণ, পচা জৈব পদার্থ	নিম্নস্তর
সরপুঁটি	জুপ্লাংকটণ ও ফাইটোপ্লাংকটণ	মধ্য ও উপরস্তর

সাধারণত কার্প জাতীয় মাছের বৃদ্ধি ২৮°- ৩১°সে. তাপমাত্রায় ভালো হয়। তবে ১১° সে. তাপমাত্রার নিচে মাছ কম খায় এবং ৯° সে. তাপমাত্রার নিচে মাছ খাদ্য গ্রহণ একেবারেই বন্ধ করে দেয়। বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের তাপমাত্রার উপযুক্ত সহনশীল মাত্রা নিম্নরূপ-

প্রজাতি	তাপমাত্রার সহনশীল মাত্রা (°সে.)
কাতলা, রুই, মৃগেল	২০°- ৩৮°সে.
সিলভার কার্প, গ্রাসকাপ	২৫° - ৩৫°সে.
কার্পিও	২০° - ৩০° সে

•

মিশ্র চাষে পানির গুণাগুণ: মাছ ও চিংড়ির বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য পানির গুণাগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে পানির গুরুত্বপূর্ণ গুণাগুণ গুলোর উত্তম মাত্রা নিম্নরূপ

পানির গুণাগুণ	মাত্রা
পিএইচ	৭-৯
তাপমাত্রা	২৮ - ৩১° সে.
খরতা	৪০-২০০ পিপিএম
ক্যালসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
লৌহ	<০.০২ পিপিএম
ঘোলাত্ব	শূন্য
অক্সিজেন	৫-৭ পিপিএম
ফসফরাস	০.১৫ পিপিএম
মোট দ্রবীভূত পদার্থ	৩০০ পিপিএম

২০২৫

২.২৫ মিশ্র চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে চাষ পদ্ধতি ৩ ধরনের হতে পারে; যথা- ব্যাপক পদ্ধতির চাষাবাদ, আধানিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদ ও নিবিড় পদ্ধতির চাষাবাদ। গলদা চিংড়ি-কার্প ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা, মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা।

২.২৫.১ মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা: পোনা মজুদের আগেই পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সাধারণভাবে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণের কাজটি কয়েকভাবে করা যায়। বাদামি সবুজ পানি মিশ্র চাষের জন্য ভালো তবে ঘোলা, ঘন সবুজ তামাটে লাল বা স্বচ্ছ পানি মিশ্র চাষের জন্য ভালো নয়। পানির রং ঠিক আছে কিনা তা নিজের চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পুকুরে পোনা মজুদের ১-২ দিন আগে পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পানিতে কোন প্রকার বিষক্রিয়া আছে কিনা তা জানার জন্য পুকুরে একটি হাপা টাঙ্গিয়ে তার মধ্যে ১০-১৫ টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে পোনা মারা না যায়, তবে বুঝতে হবে পানি বিষক্রিয়া মুক্ত এবং এভাবে বালতি বা হাড়িতেও পানির বিষক্রিয়া পরীক্ষা করা যায়।

খোলস পরিবর্তন করে চিংড়ি বড় হয়। খোলস পরিবর্তনের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে বলে এ সময় চিংড়ির আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হয়। পুকুরের তলায় কিছু উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এসব আশ্রয়স্থল চিংড়ি ও মাছকে চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করে থাকে। পুকুরের তলায় উদ্ভিদ না থাকলে আশ্রয়স্থল হিসেবে পুকুরে তাল, নারিকেল বা খেজুর গাছের শুকনো পাতা, বাঁশ, গাছের ডালপালা আশ্রয়স্থলের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চিংড়ির আশ্রয়স্থলের উপকরণ হিসেবে প্লাস্টিকের টুকরা, ইটের টুকরা, ভাঙা কলস ইত্যাদিও ব্যবহার করা যায়।

২.২৫.২ মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনা মূলত ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত। এই কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে পোনার মৃত্যুহার বহুলাংশে কমানো সম্ভব। এর ফলে সন্তোষজনক উৎপাদন নিশ্চিত হয়। পোনা মজুদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজগুলো নিচে বর্ণনা করা হল-

ক) প্রজাতি ও পরিমাণ নির্ধারণ: নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে পোনার মজুদ ঘনত্ব ও প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়।

পোনার প্রাপ্যতা: এলাকাগত প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে কার্পের পোনার জাত নির্বাচন করা উচিত। একইভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে এবং যেখানে গলদা চিংড়ির হ্যাচারি আছে সেখানে গলদার পোনা পাওয়া যায় অর্থাৎ পোনার প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করেই মিশ্র চাষের জন্য প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

পোনার আকার ও ঘনত্ব:

সারণি: মাছ ও গলদা চিংড়ির পোনা মজুদ ঘনত্ব (শতাংশ প্রতি)

প্রজাতি	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩	নমুনা-৪
কাতলা	৪-৫	১০-১১		৬-৭
সিলভার কার্প	৯-১০	--	৯-১০	৭-৮
বিগহেড কার্প	--	--	৯-১০	--
গ্রাস কার্প	১-২	১-২	৪-৫	--
রুই	৭-৮	৭-৮	৭-৮	৭-৮
সরপুঁটি	১-২	১-২	--	১-২
গলদা চিংড়ি	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫	৩২-৩৫
মোট	৫৫-৬০ টি	৫৫-৬০ টি	৫৫-৬০	৫৫-৬০

খ) পোনা শনাক্তকরণ: চাষযোগ্য নতুন প্রজাতি হিসেবে গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্তকরণে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গলদা চিংড়ির পোনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। গলদা চিংড়ির রোস্ট্রামের উপরের দিকে ১২-২৫টি এবং নিচের দিকে ৮-১৪ টি খাঁজ থাকে। মাথার ক্যারাপেস অঞ্চলের খোলসে ২-৫টি কালচে আড়াআড়ি দাগ থাকে। এছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা চিংড়ির পোনা চেনার আরেকটি উপায় হচ্ছে গলদা চিংড়ির রেণু স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে থাকে এবং কখনও কখনও চিৎ হয়ে সাঁতার কাটতে থাকে। এই রেণু পোনার পিঠে কালো দাগ বা ফোঁটা থাকে।

গ) পোনা শোধন: রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পুকুরে মজুদ করার আগে পোনাগুলো জীবাণুমুক্ত করা দরকার। একটি পাত্রের মধ্যে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পরিমাণ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। প্যাকিং করার আগে উক্ত দ্রবণে পোনাগুলোকে ১ মিনিট গোসল করাতে হবে। পোনাকে গোসল করানোর আগে পাত্রটির মধ্যে একটি ঘন জাল রেখে তার ওপর পোনা ছাড়তে হয়। উক্ত দ্রবণে প্রতিবার ৩০০-৫০০ টি করে পোনা প্রায় ৫ বার গোসল করানো যায়।

ঘ) পোনা ছাড়ার সময়: মৃদু ঠান্ডা আবহাওয়ায় অর্থাৎ সকাল বা বিকেল বেলায় পুকুরে পোনা মজুদ করা ভালো। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে, মেঘলা দিনে বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় পোনা ছাড়া উচিত নয়। চিংড়ির পোনা সাধারণত সন্ধ্যার পর ছাড়া সবচেয়ে নিরাপদ।

২.২৫.৩ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পুকুরে পোনা মজুদের পর বেশ কিছু কাজ করতে হয় যা মিশ্র চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোনা মজুদের পর এই সমস্ত কাজকে ৬টি ধাপে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) পোনার বেঁচে থাকা পর্যবেক্ষণ: পরিবহন পীড়নের কারণে দুর্বল বা রোগাক্রান্ত হয়ে পোনা মারা যেতে পারে। পোনা মারা গেলে পুকুরের তলদেশে পড়ে যায় আবার অনেক সময় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মড়া পোনা পানির ওপরে ভেসে উঠে। এসব মৃত পোনা ঢেউ এর ধাক্কায় পাড়ের কাছাকাছি চলে আসে। পুকুরে পোনা মজুদের ৬-৮ ঘণ্টা পর পাড়ের কাছাকাছি পোনার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এভাবে মৃত পোনার পরিমাণ বের করে সমসংখ্যক পোনা মজুদের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) সার প্রয়োগ:

সারণিঃ মজুদ পরবর্তী দৈনিক সার প্রয়োগের মাত্রা (শতাংশে)

সার	মাত্রা
কম্পোস্ট	৩০০-৪০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪-৫ গ্রাম
টিএসপি	৩ গ্রাম

গ) সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ: খাদ্য দানির মাধ্যমে খাদ্য প্রয়োগ করে খাদ্যের অপচয় কমানো সম্ভব। কার্পের খাদ্য দেয়ার সময় খাদ্য দানি পানির উপরিভাগের ৩০ সেমি নিচে এবং গলদার খাদ্য দেয়ার সময় তা পুকুরের তলায় ৩০ সেমি ওপরে স্থাপন করা ভালো।

গ্রাস কার্প ও সরপুঁটির খাদ্য বাঁশের তৈরি আয়তকার ভাসমান ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। ভাসমান ফ্রেমটি পুকুরের পাড় থেকে ১-২ মিটার দূরত্বে পুকুরের অভ্যন্তরে স্থাপন করতে হয়। পাতা জাতীয় উদ্ভিদ টুকরো করে কেটে ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহ করতে হয়। এই ফ্রেমের মধ্যে সরবরাহকৃত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার খাদ্য দিতে হয়। মিশ্র চাষে কার্পের খাদ্য দিনের বেলায় সকাল ১০-১১ টার মধ্যে এবং চিংড়ির খাদ্য সন্ধ্যা ও রাতে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুকুরের নির্দিষ্ট জায়গায় খাদ্য সরবরাহ করা উচিত।

ঘ) মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ: প্রজাতিভেদে সাধারণত মাছের গড় দৈনিক বৃদ্ধির হার ২-৫ গ্রাম এবং গলদা চিংড়ির বৃদ্ধি ০.৫-১%। মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করা ভালো। মোট মজুদকৃত মাছ ও চিংড়ির ৮০% বেঁচে থাকার হার ধরে তাকে নমুনার জন্য সংগৃহীত মাছ ও চিংড়ির গড় ওজন দিয়ে গুণ করে মোট গড় ওজন বের করতে হবে। এই গড় ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়।

ঙ) আহরণ: একই সময় একই আকারের মাছ ও চিংড়ির পোনা মজুদ করলেও এদের বৃদ্ধি একই রকম হয় না। পোনা মজুদের ৩-৪ মাসের মধ্যে কিছু মাছ ও চিংড়ি অন্যান্য গুলির চেয়ে বড় হয়ে যায়। যেমন- চিংড়ির পোনা মজুদের ৩-৫ মাসের মধ্যে কিছু চিংড়ির ওজন ৮০-১০০ গ্রামে পৌঁছে যায়। আবার ৪-৬ মাসের মধ্যে কিছু মাছের ওজন ৫০০ গ্রামের উপরে পৌঁছে যেতে পারে। এজন্য একসাথে সব মাছ ও চিংড়ি না ধরে বড় আকারের মাছ ও চিংড়িগুলো ধরা লাভজনক। এর ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ ও চিংড়ি পরবর্তীতে দ্রুত বাড়ার সুযোগ পায়। মিশ্র চাষের ফসল দুইভাবে আহরণ করা যায়, যথা- (১) আংশিক আহরণ, ও (২) সম্পূর্ণ আহরণ।

চ) বাজারজাতকরণ: চিংড়ি আহরণের পরও চিংড়ি বেশ কিছু সময় বেঁচে থাকে। চিংড়ি আহরণের পর বাজারজাত করতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে চৌবাচ্চার পানিতে এদেরকে কয়েকদিন রাখা যায়। এতে চিংড়ির ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না। তবে আহরণের পরপরই এদের বাজারজাত করা উত্তম। চিংড়ির গুনগতমান বজায় রাখা এবং ভালো বাজার দর পাওয়ার জন্য স্বল্প পরিমাণে চিংড়ি আহরণ করে মাথাসহ চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। চিংড়ি ধরার পরপরই এদের ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং টিউবওয়েলের পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বরফজাত করতে হবে।

২০২৫

অনুসন্ধানমূলক কাজ

তোমার এলাকার একজন চিংড়ি চাষি ভোর বেলায় এসে তোমাকে জানাল যে, তার ঘেরের সমস্ত চিংড়ি কিনারাই এসে পাড় বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করছে এবং ঘেরের মাছ ভেসে উঠেছে। এমতাবস্থায়, পুকুর পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত ছক পূরণ করো-

পরিদর্শনকৃত এলাকার নাম	
ঠিকানা	
ঘেরের আয়তন	
কোন কোন প্রজাতির মাছ পানিতে উপরে ভেসে উঠেছে?	১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.
চিংড়িসহ কোন কোন প্রজাতির মাছের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ?	১. ২.
আকাশ পরিষ্কার নাকি মেঘাচ্ছন্ন ছিল?	
পুকুরের পানির রঙ কেমন ছিল?	
পুকুরে নিয়মিত খাদ্য দেওয়া হয় কিনা?	
এই অবস্থায় তুমি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?	
আর যেন এমন না ঘটে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

২০২৫

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ

গলদা চিংড়ি ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে পোনা মজুদপূর্ব, পোনা মজুদকালিন এবং পোনা মজুদ পরবর্তী কাজগুলো পর্যায়ক্রমে লেখ।

ক্রম.	কাজের নাম	নিরাপত্তামুলক/গৃহিত ব্যবস্থা সমূহ
০১	পোনা মজুদপূর্ব কাজসমূহ	
০২	পোনা মজুদপূর্ব কাজসমূহ	
০৩	পোনা মজুদপূব কাজসমূহ	

জব ১: পুকুরের অপ্রয়োজনীয় জলজ আগাছা পর্যবেক্ষন, শনাক্তকরণ ও দমন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে এক জায়গা জমা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত উপকরণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাঝারি	১ জোড়া
০৩	সেফটি সু	মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	দা	মাঝারি আকারের	১ টি
০২	দড়ি	সাধারন ৫০ মিটার	১ টি
০৩	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০৪	ফরমালিন	৫০০ মিলি	১ টি
০৫	ঝুঁড়ি	প্রয়োজনমত	১ টি
০৬	স্পেসিমেন জার	১-৪ লিটার	৪ টি
০৭	গামছা	মাঝারি মাপের	১ টি
০৮	খাতা	প্রয়োজনমত	১ টি
০৯	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পাড় হতে, পানির উপর ভাসমান, লতানো বিভিন্ন প্রকার জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এবং শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী শনাক্ত করো।

২. প্রতিটি শ্রেণির দুই একটি করে নমুনা ফরমালিন দ্রবণে লেবেল যুক্ত স্পেসিমেন জারে সংরক্ষণ করো।

৩. যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সমস্ত আগাছা কেটে ফেলো।

৪. কর্তনকৃত সমস্ত আগাছাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে জমা করো।

সাবধানতা

- আগাছা দমনের সময় দা, কাঁচি, ছুরি অতি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- পানির ভিতরে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি সু ও লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে হবে।
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আগাছা দমনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা যেন সঠিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

আত্মপ্রতিফলন

অপ্রয়োজনীয় জলজ আগাছা পর্যবেক্ষণ, সনাক্তকরণ ও দমনে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ শনাক্তকরণ ও দূরীকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- সঠিক ভাবে রোটেনন গোলানো এবং বল বানানো
- সঠিক পদ্ধতিতে রোটেনন প্রয়োগ করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গগলস	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া
০৪	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৩	ক্যালকুলেটর	সাধারন	১ টি
০৪	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	৩ টি
০৫	কাঠের/লোহার হাতল	মাপমত	১ টি
০৬	স্টিলের বাটি	২ লিটার	২ টি
০৭	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৮	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৯	রোটেনন পাউডার	৯ মাত্রার	১.০ কেজি
১০	খাতা	প্রয়োজনমত	২ টি
১১	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	২ টি

(গ) কাজের ধারাঃ

১. রোটেনন প্রয়োগের জন্য একটি পুকুর/ঘের নির্বাচন করো।

২. পুকুর/ঘেরের জলায়তন নির্ণয়ের জন্য মাপন ফিতা ব্যবহার করে পানি বরাবর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা মেপে নাও।

৩. এবারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পুণ করে জলায়তন নির্ণয় কর। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ফুটে দেয়া থাকলে তাকে ৪৩৫.৬ দ্বারা ভাগ করে শতাংশ বের কর (১ শতাংশ = ৪৩৫.৬ বর্গফুট)।

৪. এবার ২৫ গ্রাম/শতাংশ/ফুট পানি হিসেবে মোট রোটেননের পরিমাণ নির্ণয় কর। ব্যবহারিক খাতায় ছকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা, জলায়তন ও রোটেননের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করো।

পুকুরের দৈর্ঘ্য (ফুট)	পুকুরের প্রস্থ (ফুট)	মোট জলায়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা (ফুট)	রোটেননের পরিমাণ (গ্রাম)
৫০	৩৫	৪.০২	৫	৫০৩ গ্রাম

৫. মোট রোটেননের ৩ ভাগের ২ ভাগ রোটেনন (৩০০ গ্রাম) হাড়িতে করে যথেষ্ট পরিমাণে পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৬. বাকি ১/৩ ভাগ রোটেনন (২০৩ গ্রাম) অল্প পানি দিয়ে গামলায় এমনভাবে গোলাই যেন শুকনা শুকনা দলা বানানো যায়। এভাবে তৈরিকৃত দলাকে ছোট ছোট বল আকারে তৈরি করে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৭. ৫-১০ মিনিট পর জাল টেনে আক্রান্ত মাছ ধরে ফেলো।

৮. গৃহীত কাজের ধারাটি ব্যবহারিক খাতায় চিত্রসহ লিপিবদ্ধ করো।

সাবধানতা

- রোটেনন ব্যবহারের সময় অতি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- পানির ভিতরে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি সু ও লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করতে হবে।
- রোটেনন ব্যবহার করে অবাঞ্ছিত মাছ দমনের ক্ষেত্রে রোটেননের মাত্রা যেন সঠিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

আত্মপ্রতিফলন

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দুরীকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: গলদা চিংড়ি চাষের ঘের/পুকুরে চুন প্রয়োগ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- পরিমান মত চুন সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী জায়গা পরিষ্কার করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত উপকরণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গগলস	শিক্ষার্থীর মাপমত	১ জোড়া
০৪	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমত	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	দাড়িপাল্লা/নিক্তি	সাধারন	১ টি
০৩	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৪	ক্যালকুলেটর	সাধারন	১ টি
০৫	সিমেন্টের চাড়ি	২০ লিটার	১ টি
০৬	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০৭	কাঠের/লোহার হাতল	মাপমত	১ টি
০৮	স্টিলের বাটি	২ লিটার	১ টি
০৯	কলিচুন	সাধারন মানের	১০ কেজি
১০	ডলোচুন	সাধারন মানের	১০ কেজি
১১	পাথুরে চুন	সাধারন মানের	১০ কেজি
১২	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. চুন প্রয়োগের পুর্বে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্দিষ্ট ঘের/পুকুরের পাড়ে মজুদ করো।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. মাপন ফিতা দিয়ে পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিটারে বা ফুটে পরিমাপ কর এবং নিচের হিসাব অনুযায়ী পুকুরের আয়তন নির্ণয় করো।

দৈর্ঘ্য (মিটার) × প্রস্থ (মিটার) × ৪০.৪৮ = শতাংশ

অথবা, দৈর্ঘ্য (ফুট) × প্রস্থ (ফুট) × ৪৩৫.৬ = শতাংশ

৪. আয়তন অনুযায়ী শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন কাটা ব্যারেলে / সিমেন্টের চাড়িতে রাখ। খুব সাবধানে আস্তে আস্তে চুনের মধ্যে পানি ঢাল। চুনে পানি দিলে সহসা গরম হয়ে চুন টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে। এ সময় চুনের কাছ থেকে দুরে সরে যাও। কারণ যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৫. চুন ঠান্ডা হলে ব্যারেলে বেশি করে পানি মেশাও এবং মগের সাহায্যে সুন্দর করে মিশ্রিত কর। এবারে তরল চুন বালতিতে নিয়ে বাটির সাহায্যে সমস্ত ঘের/পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৬. ঘের/পুকুর শুকনো হলে ব্যারেলের পরিবর্তে সমতল মাটিতে/সিমেন্টের চাড়িতে চুন রেখে হালকা করে পানি আগের দিন রাতে ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চুন ফেটে যাবে এবং সব চুন গুঁড়া পাউডারের মত হবে। চুন যথেষ্ট ঠান্ডা হলে পরে ঝুঁড়িতে করে পাড়সহ সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

৭. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- চুন ভেজানোর জন্য প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার না করা
- চুন ছিটানোর সময় অবশ্যই চোখে গগলস, হাতে গ্লাভস্ ও মাস্ক পরিধান করা
- চুন ছিটানোর সময় বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ি চাষের ঘের/পুকুরে চুন প্রয়োগে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: ঘের বা পুকুরে সার প্রয়োগ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- কাজের জন্য উপযুক্ত সার নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- অব্যবহৃত উপকরণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাঝারী	১ জোড়া
০৩	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমত	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ইলেক্ট্রিক্যাল ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ গ্রাম	১ টি
০২	সেকি ডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১ টি
০৩	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৪	ক্যালকুলেটার	সাধারন	১ টি
০৫	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০ লিটার	১ টি
০৬	কাঠের/লৌহার হাতল	মাপমত	১ টি

০৭	স্টিলের বাটি	২ লিটার	১ টি
০৮	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৯	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	১ টি
১০	ইউরিয়া	বাংলাদেশী	৫ কেজি
১১	টিএসপি	বাংলাদেশী	৫ কেজি
১২	কম্পোস্ট	বাংলাদেশী	২০ কেজি
১৩	খাতা	প্রয়োজন মত	১ টি
১৪	পেন্সিল	প্রয়োজন মত	২ টি

(গ) কাজের ধারা

১. ঘের বা পুকুরের নিকট যাও। সেকি ডিস্কের সাহয্যে পুকুরের স্বচ্ছতা পরিমাপ কর। সেকি ডিস্ক এর স্বচ্ছতা ৩৫ সে.মি. এর বেশি হলেই সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

২. মাপন ফিতার সাহায্যে ঘের বা পুকুরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ করে জলায়তন নির্ণয় করো।

৩. আয়তন অনুযায়ী ইউরিয়া, টিএসপি ও কম্পোস্ট সারের পরিমাণ নির্ণয় করো।

৪. টিএসপি এবং কম্পোস্ট সার একটি গামলা বা বালতিতে ৩-৪ গুণ পানির মধ্যে ১২-২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখো।

৫. অতঃপর প্রয়োগের সময় প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইউরিয়া সার মিশিয়ে নাও।

৬. ভেজানো সার কাঠের হাতল দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নাও।

৭. সূর্যালোকিত দিনে ১০-১১ টার মধ্যে মিশ্রিত সার সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দাও।

সতর্কতা

- সার ছিটানোর সময় অবশ্যই সেফটি সু, গগলস, গ্লাভস্ ও মাস্ক পরিধান করতে হবে
- বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা দিনে অবশ্যই সার ছিটানো থেকে বিরত থাক

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ি চাষের ঘের বা পুকুরে সার প্রয়োগের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৫: সেকি ডিস্কের সাহায্যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত সেকি ডিস্ক নির্বাচন করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত সেকি ডিস্ক যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও সেকি ডিস্ক চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সেকি ডিস্ক	২০ সেমি ব্যাস	১ টি
০২	মাপন ফিতা	৫০ মিটার	১ টি
০৩	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৪	খাতা	প্রয়োজন মত	১ টি
০৫	পেন্সিল	প্রয়োজন মত	২ টি

(গ) কাজের ধারা

১. চিংড়ি চাষের ঘের বা পুকুরের কাছে রৌদ্রময় দিনে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে যাও।

২. পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে ধীরে ধীরে কোমড় সমান পানিতে নামো।

৩. সেকি ডিস্ক আস্তে আস্তে পানিতে ডুবাতে থাক এবং উপর থেকে দেখতে থাক কখন চাকতিটি পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. এবারে সেকি ডিস্ক বাঁধা সুতা মিটার স্কেল দিয়ে মেপে সেকি ডিস্কের গভীরতা নির্ণয় করো।

৫. এভাবে পুকুরের আরও দুইটি স্থানে ঘোলাত্ব এড়িয়ে সেকি ডিস্ক গভীরতা নির্ণয় করো।

সতর্কতা

- প্রাকৃতিক খাদ্য পরিমাপের সময় অবশ্যই সেফটি সু, গ্লাভস ও মাস্ক পরিধান করা আবশ্যক।
- বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা দিনে অবশ্যই পরিমাপের কাজ থেকে বিরত থাক।

আত্মপ্রতিফলন

মাছ চাষের পুকুরে সেকি ডিস্কের সাহায্যে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৬: ঘেরে বা পুকুরের পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- পিএইচ স্কেল সংগ্রহ করা।
- পানিতে ডুবানোর পরে পিএইচ পেপার খুব সতর্কতার সাথে পিএইচ স্কেলের সাথে মিল করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- অব্যবহৃত মালামাল উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লাভস্	রাবারের	১ জোড়া
০৩	গামবুট	রাবারের, মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিএইচ মিটার	ডিজিটাল সাধারন মানের	১ টি
০২	পিএইচ স্কেল পেপার	ডিজিটাল সাধারন মানের	১ টি
০৩	বালতি	১৫ লিটার	১ টি
০৪	বিকার	২০০-৫০০ মি.লি.	৩ টি
০৫	কালো বোতল	২৫০ মি.লি.	৪ টি
০৬	তেঁতুল	দেশি	১ কেজি
০৭	তেঁতুলের ডাল	দেশি	পরিমানমত
০৮	চুন	সাধারন	১০ কেজি
০৯	গামছা	সুতি দেশি ৫ ফুট লম্বা	১ টি
১০	খাতা	প্রয়োজনমত	১ টি
১১	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. পুকুরের পানির পিএইচ পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. পুকুরের পানির পিএইচ পরিমাপের জন্য যথা সম্ভব পুকুরের মাঝামাঝি থেকে পানি মগে করে বা বালতিতে করে সংগ্রহ কর অথবা কালো বোতলে করে ল্যাবরেটরীতে এনে পরীক্ষা করো।

৪. সংগৃহিত পানিতে পিএইচ পেপার ডুবিয়ে উপরে উঠায়ে দেখ পিএইচ পেপারের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবার পিএইচ স্কেলের সাথে পরিবর্তিত পেপারের বর্ণ মিলিয়ে পুকুরের পানির পিএইচ এর পরিমান নির্ধারণ কর অথবা পানিতে ডিজিটাল পিএইচ মিটার ডুবিয়ে পানির পিএইচ এর পরিমাণ নির্ধারণ করো।

৫. পুকুরের পানির পিএইচ যদি আদর্শ মাত্রার চেয়ে কম থাকে তবে বাড়ানোর জন্য প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত চুন প্রয়োগ কর, ৭ (সাত) দিন পর আবার পরীক্ষা কর যদি পিএইচ এর পরিমাণ না বাড়ে তবে আবার সম পরিমান চুন প্রয়োগ করো।

৬. আর পুকুরের পানির পিএইচ যদি আদর্শ মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে তবে কমানোর জন্য বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি থেকে ২ কেজি পর্যন্ত তেতুল গুলিয়ে সমস্ত পুকুর ছিটিয়ে দাও।

৭. তেতুল পাওয়া না গেলে তেতুলের ডাল কেটে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রেখে পরের দিন সকালে তুলে ফেল অথবা নলকূপের পানি সরবরাহ করো।

সতর্কতা

- পানিতে ডুবানোর পর পিএইচ পেপার পিএইচ সূচকের সাথে মিলানোর সময় অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে চোখের ভ্রম না ঘটে।
- চুন বা তেতুলের পানি ছিটানোর পর পরই পরিমাপ করে দেখতে হবে যেন পিএইচ এর পরিমান ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে অবস্থান করে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরের পানির পিএইচ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৭: ঘের বা পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- থার্মোমিটার সংগ্রহ করা।
- সঠিক ভাবে পানি সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লাভস্	রাবারের দেশি	১ জোড়া
০৩	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	বালতি	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	থার্মোমিটার	চায়না, সেন্টিগ্রেড	১ টি
০২	এয়ারেটর	৫ অশ্ব শক্তি	১ টি
০৩	কালো বোতল	প্লাস্টিকের	৪ টি
০৪	বিকার	কাঁচের	১ টি
০৫	পানির পাম্প	২ অশ্ব শক্তি	১ টি
০৬	গামছা	সুতি, ৫ ফুট	১ টি
০৭	পেন্সিল	সাদা কাগজের ৫০ পাতার	১ টি
০৮	খাতা	২ বি	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. ঘের বা পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. ঘের বা পুকুরের পানির তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যথাসম্ভব ঘের বা পুকুরের মাঝামাঝি ও ঘের বা পুকুরের উপর, মধ্যম ও নিম্ন ভাগ থেকে পানি মগে করে বা বালতিতে করে সংগ্রহ কর এবং থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা পরিমাপ করো।

৪. তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সে. এর বেশি হলেই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা হিসেবে ঘের বা পুকুরের পানি পরিবর্তন বা এয়ারেটর চালনা বা পুকুরের এক কোনে আগাছা জমা করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো।

সতর্কতা

- পুকুরের পানির উপরের দিকের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে কমতে থাকে বলে মাঝের স্তরের পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

পুকুরের পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৮: ঘের বা পুকুরের পানির অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা।
- অক্সিজেন মিটার সংগ্রহ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	সুতি কাপড়ের	১ টি
০২	গ্লাভস্	রাবারের দেশি	১ জোড়া
০৩	গামবুট	রাবারের	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অক্সিজেন মিটার	চায়না	১ টি
০২	বিদুৎ চালিত এরেটর	বড় উন্নত মানের	১ টি
০৩	কালো বোতল	প্লাস্টিকের	৪ টি
০৪	বিকার	কাঁচের তৈরি	১ টি
০৫	গামছা	সুতি, ৫ ফুট	১ টি
০৬	খাতা	সাদা কাগজের ৫০ পাতার	১ টি
০৭	পেন্সিল	২ বি	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. ঘের বা পুকুরের পানির অক্সিজেন পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ নির্ধারিত পুকুরের কাছে যাও।

২. সুরক্ষা পোষাক পরিধান করো।

৩. ঘের বা পুকুরের পানির অক্সিজেন পরিমাপের জন্য যথা সম্ভব পুকুরের মাঝামাঝি থেকে মগে করে বা বালতিতে করে পানি সংগ্রহ কর অথবা কালো বোতলে করে ল্যাবরেটরীতে এনে পরীক্ষা করো।

৪. সংগৃহীত পানিতে ডিজিটাল অক্সিজেন মিটার ডুবিয়ে পানির অক্সিজেন এর পরিমাণ নির্ণয় করো।

৫. ঘের বা পুকুরের পানির অক্সিজেন যদি ৩ পিপিএম এর চেয়ে কম থাকে তবে পুকুরে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম ঢেউ সৃষ্টি করা, এ্যারেটর চালানো, বাহির থেকে পানি সরবরাহ ইত্যাদি পদ্ধতিতে পুকুরে অক্সিজেন এর পরিমাণ বৃদ্ধি করো।

সতর্কতা

- ঘের বা পুকুরের পানির উপরের দিকের অক্সিজেন অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে এবং ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে কমতে থাকে বলে সব স্তরের পানি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে হবে।
- এসব প্রক্রিয়ায় সাময়িক ভাবে অক্সিজেন বৃদ্ধি পেলেও অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

আত্মপ্রতিফলন

ঘের বা পুকুরের পানির অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৯: প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা পোনা সংগ্রহ ও সনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ যথাযথভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ সমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ঠেলা জাল	চটজালের তৈরি	১ টি
০২	টানা জাল	চটজালের তৈরি	১ টি
০৩	গোল থালা	টিনের/স্টিলের	১ টি
০৪	ঝিনুক		৫ টি
০৫	পাতিল	সিলভারের	২টি
০৬	আঁতশ কাঁচ	কাঁচের/প্লাস্টিকের	২টি
০৭	ড্রপার	রাবারের	২টি
০৮	পানি	পরিশ্রুত	পরিমান মতো
০৯	গ্লাস স্লাইড	কাঁচের	২টি
১০	ট্রে	স্টিলের	১টি
১১	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
১২	ব্যবহারিক খাতা	কাগজের	১টি
১৩	পেন্সিল	২ বি	২টি

(গ) কাজের ধারা

১. উপকূলীয় অঞ্চলের কোনো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গমন করো।

২. গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায় এমন স্থান নির্বাচন করো।

৩. টিনের থালায় পানিসহ কিছু পোনা নিয়ে সেগুলো সুস্থ ও সবল কিনা তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

৪. এবার বিক্রয় কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত পোনা গুলো পানিভর্তি মেজারিং ফ্লাস্কে করে পরীক্ষাগারে নিয়ে আসো।

৫. পরীক্ষাগারে এসে মেজারিং ফ্লাস্ক থেকে কিছু পোনা পানিসহ টিনের থালায় রাখো।

৬. ড্রপারের সাহায্যে ১টি পোনা পানিসহ ট্রেতে রক্ষিত গ্লাস স্লাইডের উপরিতলে রাখ এবং স্লাইডের উপর একফোঁটা পরিশ্রুত পানি দাও।

৭. এবার আতশ কাঁচ দিয়ে পোনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো।

৮. পোনার শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

৯. পেন্সিল দিয়ে পোনার চিত্র ব্যবহারিক খাতায় অঙ্কন করো।

১০. অনুশীলনকৃত কার্যক্রম ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পোনার গায়ে যাতে ক্ষতের সৃষ্টি না হয় তাই খুব সাবধানতার সাথে শনাক্তকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

প্রাকৃতিক উৎস থেকে গলদা পোনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ১০: সুস্থ ও সবল চিংড়ির পোনা নির্বাচন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- উপযুক্ত আকারের পোনা নির্বাচন
- সঠিক ভাবে সুস্থ্য সবল পিএল এর বৈশিষ্ট্য পরীক্ষাকরণ
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণসমূহ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	আঁতশ কাঁচ	৫ সেমি	১ টি
০২	প্লাস্টিকের গামলা	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	স্কেল	১ মিটার	১ টি
০৪	গামছা	ছাত্রের মাপমত	১ জোড়া
০৫	গলদা চিংড়ির পোনা	পিএল/জুভেনাইল	৫০ টি
০৬	খাতা	প্রয়োজন মত	১ টি
০৭	পেন্সিল	প্রয়োজন মত	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. পুর্ব থেকে একজন পোনা ব্যবসায়ীকে ঠিক করে রাখ যাতে অনুশীলনের সময় গলদার পিএল বা জুভেনাইল নিয়ে আসে।

২. একটা বড় গামলায় কতগুলো পিএল বা জুভেনাইল পাতিল থেকে নাও।

৩. আতস কাঁচ দিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখো

৪. পিএল/জুভেনাইল এর রঙ নীলাভ-সাদা/ছাই বর্ণের, খারাপ পিএল বা জুভেনাইল এর রঙ কালচে কালচে।

৫. পিএল বা জুভেনাইল এর অ্যান্টেনা ও উপাংগসমূহ ভাংগা থাকে না।
৬. পিএল বা জুভেনাইল এর খোলস পরিষ্কার কিন্তু খারাপ পিএল বা জুভেনাইল এর খোলস কালচে ও শেওলা যুক্ত।
৭. থালা বা গামলায় স্রোত সৃষ্টি করলে ভাল পিএল বা জুভেনাইল স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে কিন্তু খারাপ পিএল বা জুভেনাইল এক জায়গায় জড় হয়ে থাকে এটা পরীক্ষা করে দেখো।
৮. প্রতিটি পোনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, হৃষ্টপুষ্ট আছে না রোগাক্রান্ত, দুর্বল বা চিকন তা লক্ষ্য করো।
৯. গৃহীত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পোনার গায়ে ক্ষত বা পোনা খসখসে কিনা তা খুব সাবধানতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ি চাষের পুকুরে ভাল পিএল বা জুভেনাইল মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল ভাল পিএল বা জুভেনাইল নির্বাচনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ১১: চিংড়ির পোনা শোধন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য ঘের বা পুকুর পাড়ে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও অনান্য উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	গামছা	মাঝারি মাপের	১ টি
০৪	ঘন ম্যাস সাইজের জাল	মাপমত	১ টি
০৫	ইলেট্রিক্যাল ব্যালেন্স	০.০০১-১০.০০০ কেজি	১ টি
০৬	চা চামচ	মাঝারি মাপের	১ টি
০৭	মাছের পোনা	৪-৫ ইঞ্চি মাপের	৫০ টি
০৮	পটাশ বা পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	ডাক্তারী গ্রেড	৫০ গ্রাম
০৯	খাবার লবন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড	সাধারণ	৫০০ গ্রাম

(গ) কাজের ধারা

১. একটি বালতির মধ্যে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পরিমাণ পটাশ (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট) বা ২০০ গ্রাম লবণ মিশাও ।

২. এবার অভ্যস্থকরণকৃত পিএল বা জুভেনাইল হতে হাত জাল দিয়ে পিএল বা জুভেনাইল উঠিয়ে বালতির মিশ্রণে ৩০ সেকেন্ড ডুবিয়ে পুকুরে ছাড়। প্রজাতি অনুযায়ী পোনা গণনার কাজ এ সময় করে নাও ।

৩. ৩০০-৫০০ টি পিএল বা জুভেনাইল শোধনের পর আরেক বালতি মিশ্রণ তৈরি কর এবং আরও পোনা শোধন করে পুকুরে মজুদ করো।

৪. গৃহীত কার্যপ্রণালী ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- চিংড়ির পোনা ঘের বা পুকুরে ছাড়ার ঠিক আগে শোধন করতে হবে।
- একই মিশ্রণ বারবার ব্যবহার করা যাবে না।

আত্মপ্রতিফলন

চিংড়ি চাষের ঘের বা পুকুরে মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা শোধনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

২০২৫

জব ১২: চিংড়ির পোনা অভ্যস্থকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা।
- কাজের জন্য ঘের বা পুকুরের পানির কিনারায় উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা।
- সঠিক পদ্ধতিতে চিংড়ি পোনা অভ্যস্থ করা।
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও অনান্য উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গামবুট	মাপমতো	১ জোড়া

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	২ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	থার্মোমিটার	সেন্টিগ্রেড	১ টি
০৪	পলিথিন ব্যাগ ভর্তি পোনা	গলদা পিএল	পরিমান মতো
০৫	ছোট মগ	প্লাস্টিকের	১টি
০৬	ধারালো ছুরি	স্টেইনলেস স্টিলের	১টি
০৭	রিফ্রাক্টোমিটার		১টি
০৮	পিএইচ মিটার		১টি
০৯	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
১০	পেন্সিল	২বি	১টি
১১	রাবার		১টি
১২	ব্যবহারিক খাতা		১টি

(গ) কাজের ধারা

১. পাতিল বা ব্যাগে করে আনা পোনা ছায়ায় বা ঠান্ডা স্থানে রাখো।

২. এবার পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে রিফ্রাক্টোমিটার, পিএইচ মিটার ও থার্মোমিটারের সাহায্যে ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির যথাক্রমে লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রা পরীক্ষা করো। ব্যাগের পানির ও পুকুরের পানির যথাক্রমে লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার মধ্যে তারতম্য থাকলে তা ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

৩. ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির যথাক্রমে লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রার মধ্যে তারতম্য থাকলে এবার মগের সাহায্যে পলিথিন ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানি অদল বদল করে পলিথিন ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রার সমতা আনো।

৪. উভয় পানির মধ্যে লবণাক্ততা, পিএইচ ও তাপমাত্রার সমতা হয়েছে কিনা তা আবার পরীক্ষা করো।

৫. থার্মোমিটার দিয়ে পাতিলের বা ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং ঘের/পুকুরের তাপমাত্রা মেপে নাও।

৬. উভয় পানির তাপমাত্রার ব্যবধান ২ ডিগ্রী সে. এর বেশি হলে ধীরে ধীরে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিলের পানিতে মিশাতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করো।

৭. এবার পাতিল থেকে এক পঞ্চমাংশ পানি (২০%) ফেলে দিয়ে পুকুরের পানি নিয়ে পাতিল পূর্ণ করতে হবে এবং ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

৮. এভাবে ২০% হারে পানি পরিবর্তনের ফলে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার সমান হলে ব্যাগের মুখ পুকুরের পানিতে কাত করে ধরে ব্যাগের ভিতর হাত দিয়ে পানির স্রোত তৈরি করতে হবে।

৯. স্রোতের বিপরীতে পোনাগুলো পাতিল থেকে বের হয়ে পুকুরে চলে যাবে।

১০. এবার হাড়ি বা পাতিল দিয়ে পানিতে ঢেউ দিতে হবে ফলে পোনাগুলো সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়বে।

১১. পুরা কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

সতর্কতা

- পুকুরে ছাড়ার আগে পোনাকে পুকুরের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচ এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কারণ পুকুরেরর পানির তাপমাত্রা, লবণাক্ততা ও পিএইচ এর ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মজুদকালে পোনার আকস্মিক মৃত্যু হতে পারে।
- পরিবহন পাত্র ও পুকুরের পানির লবণাক্ততার তারতম্য ২ পিপিটি এর মধ্যে থাকা উচিত। এই লবণাক্ততা ঘন্টায় কমানোর হার ৩ পিপিটি এর বেশি এবং বাড়ানোর হার ১ পিপিটির বেশি হওয়া উচিত নয়।
- পিএইচ এর তারতম্য ০.৫ এর কম বা বেশি হওয়া উচিত নয়।
- মেঘলা দিনে বা প্রখর রৌদ্রের সময় পুকুরে পোনা ছাড়া যাবে না।

আত্মপ্রতিফলন

গলদা চিংড়ি চাষের ঘের/পুকুরে মজুদের জন্য সুস্থ ও সবল পোনা অভ্যস্থকরণের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-২

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ির পুকুরে সাধারণত কত ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়?
২. কচুরিপানা, কলমিলতা ও ক্ষুদিপানা কোন ধরনের উদ্ভিদ?
৩. আগাছা দমনের পদ্ধতি কয়টি?
৪. রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুইটি রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখ।
৫. ব্লিচিং পাউডারে শতকরা কত ভাগ ক্লোরিন থাকে?
৬. জৈব সার কী?
৭. খামারের আয়তনের মোট কত ভাগ নার্সারি পুকুর থাকা উচিত?
৮. গলদার নার্সারি পুকুরে পোনা মজুদের হার কত?
৯. বাংলাদেশে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদনের প্রধান উৎস কি?
১০. পোনা পরিবহনের কমপক্ষে কত সময় আগে পোনাকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে?
১১. পোনা পরিবহন কালে ব্যাগের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির কাছাকাছি রাখা হয়?
১২. পুকুরের পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রির বেশি হলে চিংড়ির মড়ক দেখা দিতে পারে?
১৩. চিংড়ি চাষের পুকুরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উত্তম মাত্রা কত?
১৪. বাগদা চিংড়ি সর্বোচ্চ কত লবণাক্ততায় বাঁচতে পারে?
১৫. চিংড়ির পুকুরে অ্যামোনিয়ার সহনীয় মাত্রা কত?
১৬. চিংড়ির জন্য পানির উত্তম পিএইচ মাত্রা কত?
১৭. পানির তাপমাত্রা কত হলে মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়?
১৮. মিশ্র চাষে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কয় ধরনের হতে পারে?
১৯. গলদা চিংড়ি ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জলজ উদ্ভিদ দমনের পদ্ধতিগুলার নাম লেখ।
২. নার্সারি পুকুরের পানির গুণাবলীসমূহ লেখ।
৩. ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লেখ।
৪. টিএসপি সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের সূত্রটি লেখ।
৫. প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত গলদা চিংড়ির পোনা শনাক্ত করণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
৬. সুস্থ ও সবল পোনা চেনার উপায়গুলো লেখ।
৭. নার্সারিতে পোনা প্রতিপালনের উপকারিতা লেখ।
৮. চিংড়ি চাষের পুকুরের পানিতে অক্সিজেন হ্রাসের লক্ষণ ও কারণগুলো লেখ।
৯. Flow through system বলতে কী বোঝায়?

১০. মিশ্র চাষের প্রজাতি নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

১১. পানিতে অক্সিজেন বৃদ্ধির উপায়গুলো লেখ।

১২. মিশ্র চাষের সুবিধাগুলো লেখ।

১৩. চিংড়ির সাথে কোন ধরণের চাষ পদ্ধতিতে কি কি প্রজাতির মাছ ব্যবহার সবচেয়ে উপযোগী এবং কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুকুরে জলজ উদ্ভিদের ক্ষতিকর দিকসমূহ বর্ণনা করো।

২. সার প্রয়োগ পদ্ধতি ও জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা করো।

৩. গলদার নার্সারি পুকুর প্রস্তুতির নিয়মাবলি বর্ণনা করো।

৪. গলদার পোনা প্যাকিং পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৫. পানির ট্যাংকে পোনা পরিবহন পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৬. গলদা চিংড়ির পুকুরে পোনা মজুদ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৭. চিংড়ির ওজনের ভিত্তিতে খাদ্য প্রয়োগের হার বর্ণনা করো।

৫. চিংড়ি চাষের ঘেরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।

৭. কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস বর্ণনা করো।

৮. গলদা চিংড়ি চাষের জন্য মাটির গুণাগুণ বর্ণনা করো।

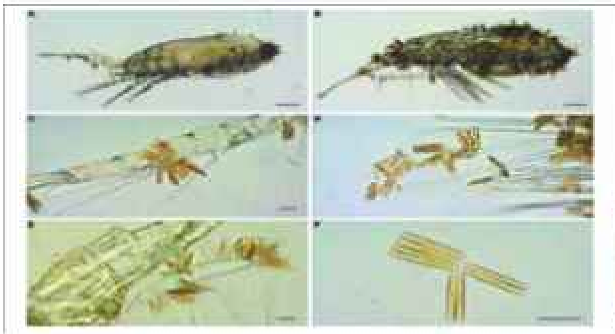
৯. গলদা চিংড়ির চাষে ব্যবহৃত পানির গুণাগুণ বর্ণনা করো।

১০. গলদা চিংড়ি চাষের পুকুর নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।

তৃতীয় অধ্যায়

গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

Feed and Feed Management of Golda Prawn





জীবন ধারণের জন্য প্রতিটি জীবই তাদের নিজ নিজ পরিবেশ থেকেই মূলতঃ খাদ্য গ্রহণ করে। গলদা চিংড়ি একটি জলজ অমেরুদন্ডী প্রাণী। তার জীবনধারণ, শরীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য জলজ পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। অতি সম্প্রতি বিশ্ববাজারে গলদা চিংড়ির উচ্চবাজার মূল্য ও চাহিদার কারণে অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অধিক চিংড়ি উৎপাদনের জন্য চিংড়ির জীবনচক্রের বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। চিংড়ির খাদ্যের প্রকৃতি ও প্রকার, খাদ্যাভাস, খাদ্য প্রদানের সময় এবং গৃহীত খাদ্য হজমের প্রক্রিয়া গলদা চিংড়ির উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শুধুমাত্র সুষম খাদ্য সঠিক নিয়মে সরবরাহ করে খামারে গলদার উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভাস অনুসারে খাদ্য প্রয়োগ করতে পারব।
- খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করতে পারব।
- সম্পূরক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ সনাক্ত করতে পারব।
- সম্পূরক খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গলদা চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করতে পারব।

৩. খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

যে সকল দ্রব্য গলধঃকরনের ফলে চিংড়ি দেহের বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয় পূরণ, দেহের তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয় এবং প্রজনন পরিপক্কতা অর্জন করে বংশবৃদ্ধি ঘটানোর উপযোগী হয় সেগুলোকে চিংড়ির খাদ্য বলা হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য একটি অপরিহার্য উপাদান। খাদ্যদ্রব্য প্রাকৃতিক (Natural) ও সংশ্লেষী (Synthetic) রাসায়নিক উপকরণের সমন্বয়ে গঠিত। জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন ও পানির ন্যায় খাদ্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিমিত পরিমাণে নিয়মিত খাদ্যের যোগান দিয়ে গলদার অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা যায়।

সুষম খাদ্য গ্রহণে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং মাছ যথাসময়ে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। এতে মাছের জনন গ্রন্থি (Gonad) পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাছের জীবন যাত্রার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যথা- রক্ত সংবহন, শ্বাসকার্য পরিচালনা, অভিস্রবনীয় চাপ নিয়ন্ত্রণ, প্রলম্বন (Suspension) ও পানির ভিতরে স্থিতাবস্থায় অবস্থানের জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তির প্রয়োজন হয়। চিংড়ি গৃহীত খাদ্য থেকে এ শক্তি পায়। এ কারণে চিংড়িকে নিয়মিত ও সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। খামারে খাদ্য সরবরাহ হঠাৎ ব্যাহত হলে এবং দীর্ঘ সময় খাদ্য প্রদান বন্ধ থাকলে চিংড়ি বন্ধ্যাত্বের শিকার হতে পারে। সুস্থ সবল চিংড়ি পোনা উৎপাদনের জন্য চিংড়িকে সঠিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রদান অত্যন্ত জরুরী। এই জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চিংড়ির পোনা মজুদ ও উৎপাদনের মাধ্যমে আরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে পরিমিত পরিমাণে সুষম সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক।

৩.১ গলদা চিংড়ির খাদ্য ও খাদ্যাভাস

গলদা চিংড়ি সর্বভূক প্রাণী। খাদ্য হিসেবে গলদা চিংড়ি প্রধানত জলজ পোকা-মাকড় ও তাদের ডিম, শুককীট বা লার্ভা, অ্যালজি, শামুক, ক্রাস্টেশিয়ান, মাছ ও অন্যান্য প্রাণী প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকে। প্রায় সকল ধরনের ক্রাস্টেশিয়ান, জুপ্লাংকটণ ও শামুক গলদা চিংড়ির অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এসব খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ থাকে যা চিংড়ির শারীরিক বৃদ্ধি ও খোলস তৈরির জন্য একান্ত প্রয়োজন। গলদা চিংড়ি সাধারণত রাতে খাদ্যের সন্ধানে পুকুর পাড়ের দিকে অল্প পানিতে বিচরণ করে এবং দিনের বেলায় গভীরে চলে যায়। এরা চিলেট যুক্ত পা দিয়ে বড় ধরনের দানাদার খাদ্য ধরে গলাধঃকরণ করে থাকে। ক্ষুধার্ত চিংড়ি খাদ্যের অভাবে যা পায় তাই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। পুকুরে খাদ্যের স্বল্পতা দেখা গেলে সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলে।

৩.২ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

গলদা চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধি এবং অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাবারের পাশাপাশি বাইরে থেকে যে বাড়তি খাবার দেয়া হয় তাকে সম্পূরক খাবার বলে। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় গলদা চিংড়ির খাদ্যেও নির্দিষ্ট মাত্রায় সকল পুষ্টি উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকা প্রয়োজন। খাদ্যে এসব পুষ্টি উপাদানের কোন একটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকলে

গলদা চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে শুধু প্রাকৃতিক খাদ্যে গলদা চিংড়ির সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। গলদা চিংড়ির এ সকল চাহিদা পূরণের জন্য বাহির হতে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের খাবার পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুঁড়া, ইত্যাদি।

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য গলদা চিংড়ি পুকুরের পরিবেশ থেকে প্রাণিকণা, উদ্ভিদকণা, তলদেশের পোকামাকড়, শুককীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষ করলে এসব প্রাকৃতিক খাদ্য গলদা চিংড়ির প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদার যোগান দিতে পারে না। ফলে গলদা চিংড়ি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে, বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং খোলস বদলাতে সমস্যা হয়। যা সার্বিক উৎপাদনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গলদা চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা সৃষ্টির পাশাপাশি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে চিংড়ির স্বজাতিভোজিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য সম্পূরক খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। পুকুরের পরিবেশে যখন খাদ্যের অভাব দেখা দেয় তখন এদের স্বজাতিভোজিতা বৃদ্ধি পায় এবং সবল চিংড়ি দুর্বল গুলোকে ধরে খেয়ে ফেলে। পরিমিত পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির এ ক্ষতিকর স্বভাব নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বর্তমানে আমাদের দেশের পুকুর-দীঘি ও উপকূলীয় চিংড়ি ঘেরগুলোতে শতাংশ প্রতি মাছ ও চিংড়ির বার্ষিক গড় উৎপাদন যথাক্রমে ৬ কেজি ও ২-২.৫ কেজি। চিংড়ি চাষে সম্পূরক খাবারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো :

- অধিক ঘনত্বে গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়,
- অল্প সময়ে গলদা চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়,
- গলদা চিংড়ির মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে যায়,
- গলদা চিংড়ির রোগ প্রতিরাধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়,
- চিংড়ির স্বজাতিভোজিতা রোধ করে, ও
- অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়।

৩.৩ খাদ্যের প্রকারভেদ

প্রকৃতিতে গলদা চিংড়ির বহু ধরনের খাদ্য বিদ্যমান। এর মধ্যে যেমন রয়েছে জলজ ক্ষুদে উদ্ভিদ ও প্রাণী, তেমনি রয়েছে দ্রবীভুত পুষ্টি উপাদানসহ অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণির পোষক। স্থল ভাগেও অসংখ্য উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য রয়েছে, যেগুলো গলদা চিংড়ির সুষম খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ি দেহের ক্ষয় পুরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয় ধরনের খাদ্যই গ্রহণ করে থাকে। মাছের এসব খাদ্য মুলত দুটি পরিবেশ বা উৎস যথা- চিংড়ি যে পরিবেশে বা মাধ্যমে বাস করে, অর্থাৎ জলজ পরিবেশ থেকে এবং জলজ পরিবেশের বাইরে অর্থাৎ স্থলভাগ থেকে আসে। খাদ্যদ্রব্যের উৎসের এ ভিন্নতা অনুসারে মাছের খাদ্যকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

৩.৩.১ প্রাকৃতিক খাদ্য

পানিতে স্বাভাবিকভাবে যে সব খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেগুলোকে গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্লাংকটণ, জলজ কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদ, ক্ষুদে পানা, পুকুরের তলদেশের পচা জৈব পদার্থ ইত্যাদি গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য।

প্রাকৃতিক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ: পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্য্যের ওপর চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুকুরে চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যের স্বল্পতা ঘটলে চিংড়ির প্রত্যাশিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। জীবমাত্রই জীবনধারণের প্রয়োজনে নানা জৈবিক কার্য সম্পন্ন করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। আর শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে সৌর শক্তি। সৌর মন্ডল থেকে তাপ ও প্রয়োজনীয় গ্যাস (কার্বন) পানিতে দ্রবীভুত নানা পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রাথমিকভাবে প্রথমে প্রাণের সৃষ্টি হয়। আর এই উদ্ভুত প্রাণিকেই বলা হয় উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্লাংকটন। এই উদ্ভিদকণার জীবন চক্র সমাপ্তির পরই পানিতে প্রাণী কণার সৃষ্টি হয় এবং এরা খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ কণার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। পুকুরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং উচ্চ শ্রেণিভুক্ত প্রাণিকূল পাশাপাশি অবস্থান করে। জীবনধারণের প্রয়োজনে এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে জলজ পরিবেশে একটি খাদ্যশৃঙ্খলের (Food chain) সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক খাদ্য দুই ধরনের, যথা-(১) উদ্ভিদ প্লাংকটন (Phytoplankton), ও (২) প্রাণী প্লাংকটন (Zooplankton)।

১) উদ্ভিদ প্লাংকটন: গলদা চিংড়ি জীবনের বিভিন্ন দশায় নিম্নোক্ত উদ্ভিদ প্লাংকটন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

- ক) নীলচে সবুজ শেওলা (Blue green algae): *Spirulina* sp. *Oedogonium* sp, *Anabaena* sp. *Nostoc* sp.
- খ) সবুজ শেওলা (Green algae): *Chlorella* sp; *Odogonilun* sp; *Cladophora* sp; *Cosmarium* sp; *Orgonium* sp.
- গ) ডায়টমস (Diatoms): *Navicula* sp; *Cyclotella* sp; *Chaetoceros* sp; *Gyrosigma* sp; *Skeletonema* sp;
- ঘ) সুতাকার শেওলা (Filamentous algae)



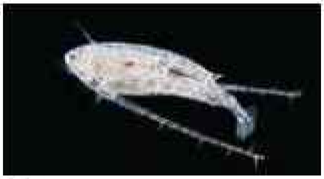
চিত্র-৩.১: উদ্ভিদ প্লাংকটন

যদিও এসব উদ্ভিদ কণা পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয় তথাপি এসব প্রাকৃতিক উদ্ভিদ প্লাংকটন কৃত্রিম উপায়ে চাষ করে পুকুরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। গলদা চিংড়ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলজ শেওলা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদ প্লাংকটনের মধ্যে ডায়টম জাতীয় শেওলা চিংড়ির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য।

২) প্রাণী প্লাংকটন: চিংড়ি নিম্নোক্ত প্রাণী প্লাংকটনসমূহ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে ।



Cyclops sp



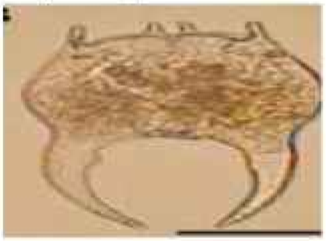
Diaptomus sp



Daphnia sp



Moina sp



Brachionus sp



Keratella sp

চিত্র-৩.২: প্রাণী প্লাংকটন

৩.৩.২ সম্পূরক খাদ্য

অধিক উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য যোগানের পাশাপাশি পুকুরের বাইরে থেকে মাছকে কিছু খাদ্য দেওয়া হয়। বাইরে থেকে দেওয়া এসব খাদ্যদ্রব্যকে সম্পূরক খাদ্য বলা হয়। চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল, ইত্যাদি মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র-৩.৩: বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক খাদ্য

৩.৩.২.১ সম্পূরক খাদ্য ও খাদ্য উপকরণ

আমাদের দেশে মাছ অথবা চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত খাদ্য উপকরণ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই সকল খাদ্য উপকরণই মুলত গলদা চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শর্করা, আমিষ, চর্বি ও অনান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই সকল খাদ্য উপাদানের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে এদের মধ্যে উচ্চমানের পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। গবেষণায় প্রাপ্ত গলদা চিংড়ির কিছু খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি: গলদা চিংড়ির কিছু খাদ্য উপকরণের নাম ও তার পুষ্টিমান

উপাদানের নাম	পুষ্টিমান (%)		
	আমিষ	শর্করা	স্নেহ
চালের কুঁড়া	১১.৮৮	৪৪.৪২	১০.৪৫
গমের ভুষি	১৪.৫৭	৬৬.৩৬	৪.৪৩
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	৩৪.৩৮	১৩.৪৪
তিলের খৈল	২৭.২০	৩৪.৯৭	১৩.১৮
ফিসমিল-এ গ্রেড	৫৬.৬১	৩.৭৪	১১.২২
ফিসমিল বি-গ্রেড	৪৪.৭৪	১৬.৮২	৭.৮৭

২০২৫

ব্লাডমিল	৬৩.১৫	১৫.৫৯	০.৫৬
আটা	১৭.৭৮	৭৫.৬০	৩.৯০
চিটাগুড়	৪.৪৫	৮৩.৬২	-
ক্ষুদিপানা	১৪.০২	৬০.৮৮	১.৯২
কুটিপানা	১৯.২৭	৫০.১৯	৩.৪৯

চিংড়ির খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ণয়ে মুলত আমিষের মাত্রা হিসেব করা হয়। সাধারণ ঐকিক নিয়মে একাধিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি খাদ্যের পুষ্টিমান সহজেই নিরূপণ করা যায়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে খাদ্যে আমিষের মাত্রা নিরূপণ পদ্ধতি দেখানো হলো। ধরা যাক ফিসমিল, সরিষার খৈল, গমের ভুষি এবং বাইন্ডার হিসেবে আটা ব্যবহার করে ১ কেজি খাদ্য তৈরি করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের অনুপাত হবে ফিসমিল ২৫%, সরিষার খৈল ২৫%, গমের ভুষি ৪০% ও আটা ১০%।

সারণি: তৈরি খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের নাম ও মোট আমিষের পরিমাণ

উপকরণ	বিদ্যমান আমিষের পরিমান (%)	ব্যবহার মাত্রা (%)	প্রয়োজনীয় পরিমাণ (গ্রাম)	সরবরাহকৃত আমিষ (%)
ফিসমিল	৫৬.৬১	২৫	২৫০	১৪.১৫
সরিষার খৈল	৩০.৩৩	২৫	২৫০	৮.৩৩
গমের ভুষি	১৪.১৭	৪০	৪০০	৫.৮২
আটা	১৭.৭৮	১০	১০০	১.৭৮
খনিজ লবণ	-	-	১চা চামচ	-
	মোট	১০০	১০০০	৩০.০৮

৩.৩.২.২ খাদ্য তৈরিতে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ ব্যবহারের অনুপাত

চিংড়ির খাদ্য তৈরির জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে এদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য উপকরণ, যেমন- খৈল, কুঁড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, আটা, চিটাগুড় ইত্যাদি ব্যবহার করেই চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন সম্পূরক খাদ্য তৈরি করা যেতে পারে। নিচে চাষির আর্থিক সামর্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা বিবেচনা করে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য তৈরিতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা নিম্ন সারণীতে উল্লেখ করা হলো-

সারণি: মিশ্রচাষের জন্য তৈরিকৃত সম্পুরক খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের অনুপাত

উপাদানের নাম	নমুনা-১		নমুনা-২	
	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য	ব্যবহার মাত্রা (%)	গ্রাম/কেজি খাদ্য
ফিসমিল	৩০	৩০০	৩০	৩০০
সরিষার খৈল	৪০	৪০০	৩০	৩০০
হাড়/ঝিনুকের গুঁড়া	-	-	৫	৫০
পলিস কুড়া/গমের ভুষি	২০	২০০	২০	২০০
আটা	৯	৯০	১০	১০০
চিটাগুড়	১	১০	৫	৫০
খনিজ লবণ	-	১-চা চামচ	-	১-চা চামচ
ভিটামিন প্রিমিক্স	-	১-চা চামচ	-	১-চা চামচ
মোট	১০০	১০০০	১০০	১০০০

৩.৩.২.৩ সম্পূরক খাদ্য তৈরির পদ্ধতি

চিংড়ি চাষিরা সাধারণত চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, ফিসমিল, মুরগীর নাড়িভুড়ি, সরিষার বা তিলের খৈল ইত্যাদি খাদ্য উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে থাকে। তবে চিংড়ি চাষিরা খামারে যে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে তা বিজ্ঞানসম্মত হয় না। কারণ চাষিরা খাদ্যের গুণগত মান ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। খামারে দেশিয় খাদ্য উপাদান দিয়ে বিভিন্ন অনুপাতে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির কয়েকটি নমুনা নিচে দেয়া হলো-

সারণি: বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য তৈরির কয়েকটি নমুনা

উপাদান	নমুনা-১	নমুনা-২	নমুনা-৩
সয়াবিন খৈল	২০%	-	৫%
মৎস্য চূর্ণ	২০%	৩০%	১০%
চিংড়ি চূর্ণ	২০%	১৫%	২৫%
চালের গুঁড়া	২০%	-	২২%
ময়দা	১৪%	১৫%	-
বার্লি	৫%	৫%	৫%
ভিটামিন মিশ্রণ	১%	-	-
সরিষার খৈল	-	১০%	৫%
চালের কুঁড়া	-	২৫%	২৫%
মাছের তৈল	-	-	৩%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

উপরোক্ত যে কোনো একটি নমুনা অনুসারে সম্পূরক খাদ্য তৈরি করে গলদা চিংড়ির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উপরোক্ত নমুনায় নির্দেশিত হারে পরিমাণমত উৎকৃষ্ট খাদ্য উপাদানসমূহ আলাদা আলাদাভাবে মেপে নিতে হবে এবং অল্প অল্প করে একটি বড় পাত্রে শুকনা অবস্থায় উপাদানগুলো ভালোভাবে মিশাতে হবে। খাদ্য উপাদানগুলো ভালোভাবে মেশানোর পর অল্প অল্প করে পানি দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটি একটি আঠালো মন্ড বা পেস্টে পরিণত করতে হবে। তারপর এই মন্ডকে হাত দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে ভেজা খাদ্য হিসেবে সরাসরি খামারে প্রয়োগ করা যায়। আবার এই খাদ্য মেশিনে পিলেট বানিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে দানাদার খাদ্যও তৈরি করা যায়।

৩.৩.২.৪ সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

চিংড়ির পুকুরে অতি সতর্কতার সাথে খাদ্য প্রয়াগ করা হয়। খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা বেশি হলে একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ বেশি হয় অন্যদিকে পানি দুষণেরও সম্ভাবনা থাকে। একটি পুকুরে কী পরিমাণ খাদ্য প্রয়াগ করা হবে তা নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়।

প্রতিদিন প্রদেয় খাবারের পরিমাণ= (মোট মজুদকৃত চিংড়ি) × {বেঁচে থাকার হার (%) × প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন × খামারে প্রয়োগের মাত্রা (%)}

উদাহরণস্বরূপ, একটি পুকুরে মোট মজুদকৃত চিংড়ির পরিমাণ = ১,০০,০০০টি

বেঁচে থাকার হার = ৭০%; প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন = ২০ গ্রাম, খাবার প্রয়োগের মাত্রা= ৬% (মোট চিংড়ির ওজনের)

এক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রদেয় খাবারের পরিমাণ = ১,০০,০০০ × ৭০ × ২০ × ৬/১০০

= ৮৪,০০০ গ্রাম

= ৮৪ কেজি

গলদা চিংড়ি নিশাচর। এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহণ করতে পছন্দ করে। সেজন্যে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের পুকরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়াগে করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দুইভাগ করে অর্ধেক ফিডিং ট্রে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাট কাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় পুকুরের তলদেশ থেকে এক ফুট উপরে ফিডিং ট্রে স্থাপন করতে হবে।

ফিডিং ট্রে পর্যবেক্ষণের পর চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ কমাতে হবে এবং কী কারণে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে গেল তা জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবস্থার উন্নতি হলে খাবার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন কারণে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যেতে পারে। কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- পুকুরে হঠাৎ ফাইটোপ্লাংকটন অধিক মাত্রায় মারা গেলে,

- দীর্ঘদিন পুকুরের পানির পরিবর্তন করা না হলে,
- পুকুরের পানির পিএইচ মাত্রা কমে গেলে,
- পুকুরের তলদেশের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে,
- চিংড়ি রোগাক্রান্ত হলে,
- চিংড়ি খোলস পাল্টালে,
- দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ২.৫ পিপিএম এর নিচে নেমে গেলে, এবং
- পানির তাপমাত্রা ৩০° সে. এর উর্ধ্বে বা ২০° সে. এর নিচে নেমে গেলে।

খাদ্য প্রয়োগে সতর্কতা

- প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে;
- মাঝে মাঝে ফিডিং ট্রে উঠিয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পুনরায় নির্ধারণ করতে হবে' এবং
- পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

৩.৪ চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও দৈহিক বৃদ্ধি

নমুনা সংগ্রহের সময় ৫ গ্রামের কম ওজনের চিংড়ির নমুনা ফিডিং ট্রে থেকে এবং এর অধিক ওজনের চিংড়ির নমুনা খেপলা জালের মাধ্যমে পুকুর থেকে চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে পুকুরে চিংড়ির মজুদ নির্ণয় করা যায়। এছাড়া নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে চিংড়ির স্বাস্থ্য, বাঁচার হার ও পুকুরের তলদেশের অবস্থা জানা যায়। খেপলা জালের মাধ্যমে মোট চিংড়ির সংখ্যা ও দৈহিক বৃদ্ধি জানার জন্য পুকুরের বিভিন্ন স্থানে ১০-১৫ বার জাল টেনে চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে চিংড়ির মজুদ নির্ণয় করা যায়।

মোট চিংড়ির সংখ্যা = গড়ে একবারে ধৃত চিংড়ির সংখ্যা/জালের আয়তন (ব. মিটার) × পুকুরের আয়তন (ব. মিটার)

জালের আয়তন= ৩.১৪ × (জালের ব্যাসার্ধ)²

দৈহিক বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের জন্য পুকুর থেকে ০-৪০ টি চিংড়ির দৈর্ঘ্য ও ওজন মেপে গড় ওজন বের করতে হবে। পুকুরে দৈনিক কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ প্রয়াজেন তা নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে বের করা যায়।

দৈনিক মোট খাদ্যের পরিমাণ = বেঁচে থাকা চিংড়ির সংখ্যা × গড় ওজন × খাদ্য সরবরাহের হার (%)

সাধারণত ৭-১০ দিন পর পর চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধি ও বাঁচার হার নির্ণয় করা হয়। একবার নমুনা সংগ্রহ করে দৈহিক বৃদ্ধি ও বাঁচার হার নির্ণয় করে উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী নমুনা সংগ্রহ পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ না করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির পরিমাণ হিসেব ধরেই খাদ্য সরবরাহ করা উচিত এবং এতে চিংড়ির উৎপাদনেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

সারণি: চিংড়ির দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিমাণ

গড় ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
০.২-০.১	১৫-১৩
১-২	১৩-১১
২-৩	১১-৯
৩-৪	৯-৭
৫-১৩	৭-৫.
১৩-২০	৫-৩
২০-৩০	৩-২০

এফসিআর: খাদ্য সরবরাহের ফলে তা দৈহিক বৃদ্ধিতে কতটুকু সহায়তা হল তা জানার জন্য নিয়মিত এফসিআর (Food Conversion Ratio) নির্ধারণ করা প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে এফসিআর হচ্ছে সে মুহূর্ত পর্যন্ত একটি পুকুরে সরবরাহকৃত সর্বমোট খাদ্য দ্বারা কী পরিমাণ চিংড়ি উৎপাদিত হলো। কোনো একটি পুকুরে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত ২০০ কেজি খাদ্য সরবরাহ করে ১০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হলে সে মুহূর্তে এফসিআর হচ্ছে ১০০ : ২০০= ১ : ২ অর্থাৎ ২ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করে ১ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে।

পুকুরে পোনা মজুদের হার, খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ, খাদ্যের গুণাগুণ এবং আহরণকালে চিংড়ির আকারের ওপর সাধারণত এফসিআর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সাধারণত চিংড়ি চাষের শেষ পর্যায়ে এফসিআর ২ এর বেশি হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। চিংড়ি চাষের প্রথম দিকে সাধারণত চিংড়ি দ্রুত বাড়ে ফলে প্রথম দিকে এফসিআর চাষের শেষের দিকের চেয়ে তুলনামুলকভাবে কম হয়।

অনুসন্ধানমূলক কাজ-১

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেকোন একটি চিংড়ি/ মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করে নিম্নের ছক পূরণ করো-

পরিদর্শনকৃত মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নাম	
ঠিকানা	
কি কি ধরনের খাদ্য উৎপাদন করা হয়?	১. ২. ৩.
খাদ্য উৎপাদনে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়?	১. ২. ৩
কারখানার কর্মী সংখ্যা কত?	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে?	১. ২. ৩.
চিংড়ি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার কর্ম পরিবেশ সম্পর্কে মতামত দাও	১. ২. ৩.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

শ্রেণির তাত্ত্বিক কাজ-১

চিংড়ি/মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানায় নিরাপদে কাজ করতে তোমরা কী ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত তা ছকে লেখ।

ক্রম	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
০১	পিলেট মেশিনের মাধ্যমে চিংড়ি/মৎস্য খাদ্য তৈরি করা	হ্যান্ড গ্লাভস্, অ্যাপ্রন ইত্যাদি

অনুসন্ধানমূলক কাজ-২

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যে কোন একটি চিংড়ি ঘের/পুকুর/খামার পরিদর্শন কর যেখানে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে চিংড়ির বল জাতীয় খাদ্য তৈরি করা হচ্ছে। এর কর্ম পরিবেশ ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানার নাম	
ঠিকানা	
গলদা চিংড়ি ছাড়া আর কোন প্রজাতির মাছের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা হয় কি?	১. ২. ৩.
খাদ্য উৎপাদনে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়?	১. ২. ৩
খাদ্যে ব্যবহৃত খৈল আগে ভিজিয়ে রাখা হয় কী না?	
কারখানার কর্মী সংখ্যা কত?	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে?	১. ২. ৩.
চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন কারখানার কর্ম পরিবেশ সম্পর্কে মতামত দাও	১. ২. ৩.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

জব ১: ঘের বা পুকুরের চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নির্ণয়

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা, এবং
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুযায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	উপকরণের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেকি ডিস্ক	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	প্লাংকটন নেট	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৩	কাঁচের গ্লাস	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৪	আঁতশ কাঁচ	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৫	মিটার স্কেল	১ মিটার	১টি
০৬	মাপন ফিতা	১০০ মিটার	১টি
০৭	গামছা	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৮	টিস্যু পেপার	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৯	মাপন ফিতা	১০০ মিটার	১টি
১০	খাতা, পেন্সিল	প্রয়োজন মতো	১ সেট

(গ) কাজের ধারা

সেকি ডিস্ক ব্যবহার করে

১. চিংড়ি চাষ হয় এমন একটি ঘের বা পুকুরের কাছে রৌদ্রময় দিনে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে যাও।

২. পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে ধীরে ধীরে ২ ফুট গভীর পানিতে নাম।

৩. সেকি ডিস্ক আস্তে আস্তে পানিতে ডুবাতে থাক এবং উপর থেকে দেখতে থাক কখন চাকতিটি পানির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. এবারে সেকিডিস্ক বাঁধা সুতা মিটার স্কেল দিয়ে মেপে সেকি ডিস্কের গভীরতা নির্ণয় করো।

৫. এভাবে পুকুরের আরও দুইটি স্থানে ঘোলাত্ব এড়িয়ে সেকি ডিস্ক গভীরতা নির্ণয় করো।

৬. সেকি ডিস্কটির গভীরতা ২৫ সেন্টিমিটার বা তার কম হলে বুঝবে পানিতে অতিরিক্ত খাদ্য আছে।

৭. গভীরতা ২৬ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয় তবে বুঝবে পানিতে পরিমিত পরিমাণ খাদ্য আছে।

৮. গভীরতা ৩৫ সেন্টিমিটার এর বেশি হলে বুঝবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা কম আছে।

হাত ব্যবহার করে

১. পুকুরে পানি ঘোলা হয়নি এমন স্থানে রৌদ্রময় দিনে ১০-১১টায় ধীরে ধীরে উরু সমান পানিতে নাম এবং নিজের একটি হাত সোজা করে পানিতে ডুবিয়ে দাও।

২. এবারে উপর হতে হাতের তালু দেখার চেষ্টা কর। যদি হাতের তালু দেখা না যায় তাহলে বুঝবে পানিতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। পানি ঘোলা হলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।

কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করে

স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে দেখলে গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্যকণা দেখা গেলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

১. একটি গামছা দুইজনে পানির মধ্যে কিছুদূর টান। মাছ ধরার মত করে পানি আস্তে আস্তে কমাও।

২. এবারে গামছার মধ্য থেকে স্বচ্ছ গ্লাসে এক গ্লাস পানি নাও।

৩. এবারে গ্লাসটি সূর্যের আলোর দিকে ধর এবং পানির মধ্যে ভাসমান খাদ্যকণা দেখার চেষ্টা করো।

৪. যদি গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুজির মত খাদ্যকণা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে গ্লাসের পানিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। খাদ্যকণাগুলো বড় দেখার জন্য আঁতশ কাঁচের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

সতর্কতা

- পানি ঘোলা হলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়,
- হাতের তালু স্বচ্ছ না হলে এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ণয় করলে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

আত্মপ্রতিফলন

সেকি ডিস্ক ব্যবহার করে, হাত ব্যবহার করে এবং কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য উপাদান সনাক্তকরণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সংগ্রহ করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা, এবং
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	উপকরণের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ডিজিটাল ব্যালেন্স	২০ কেজি পর্যন্ত	২ টি
০২	প্লাস্টিকের গামলা	প্রমাণ সাইজ	১০ টি
০৩	প্লাস্টিকের বালতি	প্রমাণ সাইজ	৪ টি
০৪	প্লাস্টিকের মগ	প্রমাণ সাইজ	২ টি
০৫	প্লাস্টিকের ব্যালচা	প্রমাণ সাইজ	২ টি
০৬	গামছা	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৭	টিস্যু পেপার	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৮	খাতা	সাদা কাগজের	১টি
০৯	ফিসমিল/চিংড়ি মাথা চূর্ণ	দেশি	২ কেজি
১০	চালের কুঁড়া	দেশি	২ কেজি
১১	সাবু দানা	দেশি	২ কেজি
১২	গমের ভুষি	দেশি	২ কেজি

২০২৫

১৩	ময়দা	দেশি	২ কেজি
১৪	সয়াবিন তৈল	দেশি	২ কেজি
১৫	চিটাগুড়	দেশি	২ কেজি
১৬	সরিষার খৈল	দেশি	২ কেজি
১৭	লবণ	দেশি	১ কেজি
১৮	ভিটামিন মিক্সার	দেশি	১ কেজি
১৯	৮/১০ পলিথিন ব্যাগ	দেশি (২৪ইঞ্চি/৩৬ইঞ্চি)	২০ টি
২০	পেন্সিল	২ বি	২টি
২১	ব্যবহারিক খাতা	দেশি	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. নিকটস্থ বাজার থেকে ফিসমিল, চালের কুঁড়া, তিলের খৈল, গমের ভূষি, ময়দা, সয়াবিন, খৈল, সরিষার খৈল, চিটাগুড় প্রভৃতি উপাদান আলাদা আলাদা ভাবে ছোট পলিথিন ব্যাগে সংগ্রহ করো।

২. সংগৃহীত খাদ্য উপাদান গুলো পরীক্ষাগারে নিয়ে বিভিন্ন গামলায় ঢালো।

৩. প্রতিটি গামলার খাদ্য উপাদানগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর এবং শনাক্ত করো।

৪. প্রতিটি খাদ্য উপাদানের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

৫. এবার খাদ্য উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যাবহারিক খাতায় লেখ।

৬. পরীক্ষা শেষে খাদ্য উপাদানগুলো পরীক্ষাগারে সংরক্ষণ করো।

সতর্কতা

- ফিসমিল ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে ফিস মিলের পরিবর্তে যেন মিটবোন না হয়।
- চালের কূড়া পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যেন এর ভিতর তুষ না থাকে।

আত্মপ্রতিফলন

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপকরণ পর্যবেক্ষণ করে সনাক্ত করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: ফিডিং ট্রেতে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ কৌশলের দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান ও পরিবেশ তৈরি করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী সম্পুরক খাদ্য সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংরক্ষণ করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজ শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এ্যাপ্রোন	শিক্ষার্থীর মাপ মতো	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাঝারি মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৪	গামবুট	রাবারের তৈরি	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারি সাইজের	১টি
০৬	ছাতা/রেইনকোট	মানসম্পন্ন (দেশি/বিদেশি)	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস্, ইকুইপমেন্টস, মেশিন)

ক্রম.	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	প্লাস্টিকের বালতি/ গামলা	১৫ লিটার	১টি
০২	হাফ ড্রাম	২৫ লিটার	১টি
০৩	ঝাঁকি জাল	মাঝারি আকারের	১টি

(গ) প্রয়োজনীয় মালামাল

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	ফিডিং ট্রে	মাঝারি আকারের (১ বর্গ মিটার)	২টি
০২	সম্পুরক/পিলেট খাদ্য	সুষম খাদ্য	১০ কেজি
০৩	ইলেক্ট্রিকাল ব্যালান্স	০০০.১-১০,০০০ গ্রাম	১টি
০৪	গামছা/তোয়ালে	মাঝারি মাপের	১টি

০৫	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু প্যাকেট	১টি
০৬	খাতা, পেন্সিল	পরিমাণ মতো	১টি করে

(ঘ) কাজের ধারা

১. প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সুরক্ষা পোষাক পরিধান করে নির্ধারিত গলদা চিংড়ির পুকুরে গমন করো।

২. পুকুর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে মজুদকৃত মোট চিংড়ির ওজন নির্ণয় করো।

৩. অতঃপর মজুদকৃত মোট চিংড়ির ওজনের ৫-১০% হারে মোট খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করো। প্রতিদিন খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ= মোট মজুদকৃত চিংড়ি × বেঁচে থাকার হার (%) × প্রতিটি চিংড়ির গড় ওজন × খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা (%)।

৪. এবার নির্ধারিত মোট খাদ্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করে এক অংশ সকালে ও অবশিষ্ট অংশ সন্ধ্যায় ফিডিং ট্রে'র মাধ্যমে পুকুরে প্রয়োগ করো।

৫. সন্ধ্যায় খাদ্য প্রয়োগের পূর্বে ফিডিং ট্রে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা কোন খাদ্য অবশিষ্ট আছে কিনা। যদি খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তবে খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া আর যদি খাদ্য অবশিষ্ট না থাকে তবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

৬. পুরো কার্যক্রমটি ধৈর্য্য সহকারে করা এবং গৃহীত কার্যক্রমটি ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

কাজের সতর্কতা

- খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। খাদ্য মানসম্পন্ন না হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে।
- বড় পুকুরের ক্ষেত্রে একাধিক ফিডিং ট্রে স্থাপন করতে হবে। সাধারণভাবে প্রতি একরে ৩-৪টি ফিডিং ট্রে স্থাপন করা হলে চিংড়ির খাদ্য গ্রহণে প্রতিযোগিতা কম হয়।
- জোয়ার-ভাটা ও ঋতুচক্রের সাথে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা

আত্মপ্রতিফলন

ফিডিং ট্রেতে করে গলদা চিংড়ির পুকুরে সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ কৌশলে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: বিভিন্ন খাদ্য উপাদান সমূহের মিশ্রণের মাধ্যমে গলদা চিংড়ির সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুতকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সংগ্রহ করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা, এবং
- কাজের শেষে তালিকা অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	উপকরণের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ডিজিটাল ব্যালেন্স	২০ কেজি পর্যন্ত	২ টি
০২	প্লাস্টিকের গামলা	প্রমাণ সাইজ	১০ টি
০৩	প্লাস্টিকের বালতি	প্রমাণ সাইজ	৪ টি
০৪	প্লাস্টিকের মগ	প্রমাণ সাইজ	২ টি
০৫	প্লাস্টিকের ব্যালচা	প্রমাণ সাইজ	২ টি
০৬	সিমেন্টের চাড়ি	প্রমাণ সাইজের	২টি
০৭	পিলেট মেশিন	২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন	১ টি
০৮	মিক্সার মেশিন		১টি
০৯	গ্রাইন্ডার মেশিন	২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন	১টি
১০	গামছা	প্রমাণ সাইজ	১টি
১১	টিস্যু পেপার	প্রমাণ সাইজ	১টি
১২	খাতা	সাদা কাগজের	১টি
১৩	ফিসমিল/চিংড়ি মাথা চুর্ণ	দেশি	২ কেজি

২০২৫

১৪	চালের কুঁড়া	দেশি	২ কেজি
১৫	সাবু দানা	দেশি	২ কেজি
১৬	গমের ভুষি	দেশি	২ কেজি
১৭	ময়দা	দেশি	২ কেজি
১৮	সয়াবিন তৈল	দেশি	২ কেজি
১৯	চিটাগুড়	দেশি	২ কেজি
২০	সরিষার খৈল	দেশি	২ কেজি
২১	লবণ	দেশি	১ কেজি
২২	ভিটামিন মিক্সার	দেশি	১ কেজি
২৩	৮/১০ পলিথিন ব্যাগ	দেশি (২৪ইঞ্চি/৩৬ইঞ্চি)	২০ টি
২৪	পেন্সিল	২ বি	২টি
২৫	ব্যবহারিক খাতা	দেশি	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. উপরে বর্ণিত খাদ্য উপাদান গুলো নিকটস্থ বাজার থেকে বাজারদর যাচাই করে সংগ্রহ করো।

২. অতঃপর খাদ্য উপাদান গুলো পরীক্ষাগার কক্ষে নিয়ে এসে শুকনা অবস্থায় ভালোভাবে চাড়িতে মিশিয়ে ফেলো।

৩. উপাদান গুলো উত্তমরূপে মিশানোর পর মগে করে অল্প অল্প পানি দিয়ে সমগ্র মিশ্রণটি ভালোভাবে নেড়ে আঠালো পেস্ট বা মন্ডে পরিণত করো।

৪. এবার এই মন্ডের কিছু অংশ হাত দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি কর এবং অবশিষ্ট অংশ সেমাই বা মিনসিং মেশিন দিয়ে পিলেট খাদ্য তৈরি করো।

৫. পিলেট খাদ্য গুলো এবার চাটাইয়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে নাও এবং বলগুলো ভেজা খাদ্য হিসাবে সরাসরি পুকুরে প্রয়োগ করো।

৬. এবার কাজ গুলো ধারাবাহিক ভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- মিশ্রণের কাজটি যেন খুব ভালভাবে হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- পিলেটগুলো সরাসরি রৌদ্রে না শুকিয়ে ছায়াযুক্ত রৌদ্রে শুকানো উত্তম।

আত্মপ্রতিফলন

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে গলদা চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

২০২৫

জব ৫: চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং সংগ্রহ করা, ও
- কাজের শেষে চেকলিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোরা
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম	উপকরণের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	টপ লোডিং ব্যালেন্স	১ গ্রাম হতে ১০ কেজি	১ টি
০২	স্প্রিং ব্যালেন্স	২০ কেজি পর্যন্ত	১টি
০৩	ডিজিটাল ব্যালেন্স	২০ কেজি পর্যন্ত	১টি
০৪	স্কুপ নেট বা হাত জাল		১টি
০৫	ঝাঁকি জাল		১টি
০৬	একটি বড় হাড়ি	৩০ লিটার	১টি
০৭	হাপা	২ মিটার × ৪ মিটার	১টি
০৮	মিটার স্কেল	১ মিটার	১টি
০৯	গামছা	সুতির	১ টি
১০	টিস্যু পেপার	সাধারণ	১ টি
১১	খাতা, পেন্সিল	প্রয়োজন মত	১ টি
১২	ক্যালকুলেটর	সাধারণ	১ টি
১৩	পুকুরের রেকর্ড বই	প্রয়োজন মত	১ টি

(গ) কাজের ধারা

১. ঝাঁকি জাল দিয়ে পুকুরের বিভিন্ন স্থান থেকে চিংড়ি ধরে গুণে গুণে পরিষ্কার পানিতে বড় হাড়ির মধ্যে রাখো। ৩০০ গ্রামের মোট মজুদের ৮- ১০% চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. সংগৃহীত চিংড়ি চট জাল দ্বারা তৈরি ছোট থলেতে করে দ্রুত ব্যালেন্স দ্বারা ওজন করে খাতায় লিখে রাখো।

৩. মোট ওজনকে চিংড়ির সংখ্যা দিয়ে ভাগ কর। ধর, পুকুরে ৭৫০০টি চিংড়ি পোনা মজুদ করা হয়েছিল। নমুনা হিসাবে ধরা হয়েছে ৭৫০টি চিংড়ি ওজন করে দেখা গেল মোট ১১ কেজি ২৫০ গ্রাম অতএব, ১১.২৫০/৭৫০ = ০.০১৫ কেজি বা ১৫ গ্রাম গড় ওজন।

৪. ৮০% বেঁচে থাকার হার ধরে পুকুরে এ সময়ের অনুমানকৃত চিংড়ির মোট ওজন হবে

(৭৫০০×৮০)/১০০ = ৬০০০টি চিংড়ি

৬০০০×০.১৫ = ৯০ কেজি চিংড়ি আছে।

৫. পুকুরের রেকর্ড বইতে তারিখসহ নমুনা সংগ্রহের তথ্য বিস্তারিত লিখে রাখো।

৬. গৃহীত কার্যক্রমটি চিত্রসহ ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- নমুনা সংগ্রহকালীন সময়ে নমুনায়নকৃত চিংড়ির শরীরে কোন রোগ বালাই আছে কিনা তা খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করো
- চিংড়িকে খুব সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হয় যেন কোন উপাঙ্গ ভেংগে না যায়।

আত্মপ্রতিফলন

ঝাঁকি জাল দিয়ে ঘের বা পুকুরের বিভিন্ন স্থান থেকে চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ করে চিংড়ির বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী- ৩

অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চিংড়ির খাদ্য কয় প্রকার?
২. পুকুরে সবল চিংড়ি কখন দুর্বল চিংড়িকে আক্রমণ করে?
৩. ক্ল্যাডোসেরা কোন ধরনের শেওলা?
৪. কোন ধরনের শেওলা চিংড়ির সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য?
৫. ডাফনিয়া, ময়না, সাইক্লাপস, ডাইপটোমাস প্রভৃতি কোন জাতীয় প্রাণিপ্লাংকটন?
৬. এফসিআর কি?
৭. চিংড়ি চাষের প্রথম মাসে প্রতিটি ফিডিং ট্রেতে কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক খাদ্য বলতে কী বোঝায়। প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রকারভেদ লেখ।
২. সম্পুরক খাদ্য কী? সম্পুরক খাদ্যে ব্যবহার করা হয় এরূপ কয়েকটি খাদ্য উপাদানের নাম লেখ।
৩. প্রতিদিন পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের সূত্রটি লেখ।
৪. চিংড়ির খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে যাওয়ার বিভিন্ন কারণগুলো লেখ।
৫. সুষম খাদ্য গ্রহণ মাছের জন্য জরুরী কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিংড়ির খাদ্যচক্রটি লেখ।
২. চিংড়ির খাদ্যের প্রকারভেদ বর্ণনা করো।
৩. সম্পূরক খাদ্য তৈরির পদ্ধতি লেখ।
৪. সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করো।
৫. সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
৬. এফসিআর নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৭. কারখানায় তৈরি খাদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

২০২৫

চতুর্থ অধ্যায়

গলদা চিংড়ির আহরণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

Harvesting, Marketing and Processing of Golda Prawn



ভালো বাজারমূল্য পেতে চিংড়ি বাজারজাত করার পূর্বে এর গুণগতমান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আহরণ ও আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার ওপর চিংড়ির গুণগতমান ও বাজার মূল্য নির্ভর করে। আহরণ হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয়। চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রেও সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সফলভাবে চিংড়ি চাষ করে চিংড়ির সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায় না। চিংড়িকে অক্ষত রেখে অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি আহরণ করা উচিত। স্বল্প সময়ে আহরণ করলে চিংড়ির গুণগতমান ভালো থাকে এবং ক্রেতার নিকট থেকে ভালো দাম পাওয়া যায়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- গলদা চিংড়ি আহরণ করতে পারব
- গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ করতে পারব
- গলদা চিংড়ির প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারব
- গলদা চিংড়ি প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ করতে পারব।

৪। গলদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ

চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে আহরণ ও বাজারজাতকরণ। সঠিক সময়ে চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাত করতে না পারলে চিংড়ি চাষে আশানুরুপ লাভ পাওয়া যায় না। খোলস বদলানোর মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়ি আহরণ করা উত্তম। তাছাড়া ভোর বেলা চিংড়ি আহরণ করা উচিত যাতে সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব হয়। সময়মত চিংড়ি বাজারজাত করা সম্ভব না হলে গুণগতমান বিনষ্ট হয় এবং বাজারে চাহিদা থাকে না।

৪.১ গলদা চিংড়ি আহরণের সময়কাল

খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে পুকুর হতে চিংড়ি ধরাই হচ্ছে আহরণ। লাভজনকভাবে চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য। চিংড়ি কখন আহরণ করতে হবে তা সাধারণত চিংড়ির গড় ওজন ও বাজার দরের ওপর নির্ভরশীল। তবে খামার বা পুকুরের পরিবেশগত অবস্থা ঠিক থাকলে গলদা চিংড়ি ৬-৮ মাসের মধ্যেই বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়ে উঠে। চাষ পদ্ধতিতে সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমার "জো" বা "গোন"-এর সময় চিংড়ির আহরণ করা হয়। পুকুরের ৫% এর বেশি চিংড়ির খোলস নরম থাকলে চিংড়ি আহরণ করা ঠিক নয়। সাধারণত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা কাটালের ২-৩ দিন পর অধিকাংশ চিংড়ির খোলস শক্ত থাকে এবং মরা কাটালের পর সাধারণত অধিকাংশ চিংড়ির খোলস নরম থাকে। তাই ভরা কাটালের সর্বোচ্চ জোয়ারের ২-৩ দিন পরই চিংড়ি আহরণের উত্তম সময় এবং পরিষ্কার আবহাওয়ায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উচিত। বিশেষ করে ভোর বেলা মাছ ও চিংড়ি ধরার উত্তম সময়। এ ছাড়াও স্থানীয় বাজারের সময়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪.২ গলদা চিংড়ি আহরণ পদ্ধতি

মাথাসহ ৭০-৮০ গ্রাম ওজনের চিংড়ি আহরণ করা লাভজনক। সাধারণত এ ওজনে পৌঁছানোর পরপরই চিংড়ি আহরণ শুরু করা হয়। চিংড়ি আহরণের জন্য সাধারণত ঝাঁকি বা খেপলা জাল, বেড় জাল অথবা বাঁশের তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। তবে চিংড়ি চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই আহরণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। গলদা চিংড়ি সাধারণত দুই পদ্ধতিতে আহরণ করা হয়; যথা-

৪.২.১. নির্বাচন পদ্ধতিতে আহরণ

বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতির আলোকে নির্বাচন পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতিতে যেমন পার্থক্য আছে ঠিক তেমনি আহরণ পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে চিংড়ি আহরণের উপায়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

ক) মিশ্র চাষ পদ্ধতির আহরণ: এই পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেত্রে মাছের ওজন ৫০০ গ্রাম হলে এবং চিংড়ির ওজন ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম (মাথা সহ) হলে এদের ধরে ফেলা উচিত। সাধারণত পোনা মজুদের ৩ মাস পর থেকে জাল টেনে উপরোক্ত ওজনের মাছ ও চিংড়ি আহরণ করে বাজারজাত করা দরকার। বিশেষ করে বড় চিংড়ি আহরণ করা উচিত। কেননা চিংড়ি স্বজাতিভোজি প্রাণী। ফলে বড় ও সবল চিংড়ি সদ্য খোলস পাল্টানো ছোট

১০২৬

দুর্বল চিংড়িকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা বেশি থাকে। মিশ্র চাষের পুকুরে চিংড়ি আহরণের জন্য সাধারণত খেপলা জাল, বেড় জাল ও বাঁশের চাই ব্যবহার করা হয়। তবে বাঁশের চাই ব্যবহার করে চিংড়ি আহরণ করা ভাল। এতে ছোট চিংড়ির আঘাত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

খ) দলগত চাষ বা ব্যাচ কালচার পদ্ধতির আহরণ: এ পদ্ধতিতে একই সময়ে একই বয়সের চিংড়ির পোনা পুকুরে মজুদ করা হয়। ৩-৪ মাস পর চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযোগী হলে প্রতি মাসে জাল টেনে বড় চিংড়িগুলিকে আগেই ধরে ফেলা হয় এবং ৭-৮ মাস পর পুকুরের সম্পূর্ণ পানি বের করে দিয়ে বাকি চিংড়ি আহরণ করা হয়।

গ) অনবরত চাষ পদ্ধতির আহরণ: এ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের ৩-৪ মাস পর প্রতি "জো" তে জাল দিয়ে বড় আকারের চিংড়ি আহরণ করা হয় এবং আহরণকৃত চিংড়ির সমপরিমাণ পোনা পুনরায় উক্ত পুকুরে মজুদ করা হয়। পরবর্তীতে অধিকাংশ চিংড়ি বিক্রয়যোগ্য আকারে পরিণত হলে পুকুরের সম্পূর্ণ পানি বের করে বাকি চিংড়ি ধরে ফেলা হয়। সম্প্রসারিত বা উন্নত হালকা সম্প্রসারিত চাষ পদ্ধতিতে এভাবে চিংড়ি আহরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত পোনা মজুদের ৬-৭ মাস পর থেকেই এই পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ শুরু করা হয়।

৪.২.২ সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি

সনাতন, উন্নত হালকা চাষ পদ্ধতি বা আধা-নিবিড় চাষ ইত্যাদি সকল প্রকার চাষ পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ফলন আহরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে চিংড়ির মিশ্রচাষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে আহরণ সুবিধাজনক। চিংড়ি আহরণের আগে চাষির নিম্নবর্ণিত প্রস্তুতি ও আহরণকালীন সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত -

- উপযুক্ত পরিবহন যানসহ চিংড়ির ক্রেতা পূর্বেই নির্ধারিত রাখা
- ভোর রাতে চিংড়ি ধরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ধৃত চিংড়ি ভালাভোবে ধোয়ার জন্য পরিষ্কার পানির সরবরাহ রাখা
- অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় এবং তারপর দুদিন গলদা চিংড়ি না ধরা, এসময় বেশির ভাগ গলদা চিংড়ির খোলস নরম থাকে
- ধরার সময় চিংড়ি যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সে জন্য যথা সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা
- চিংড়ি ধরেই তা ছায়ায় রাখার জন্য খামারে উপযুক্ত ছাউনির ব্যবস্থা করা
- মাটি, ঘাস, বাঁশের ঝুড়ি ও চাটাই, হোগলার পাটি, পাটের চট ইত্যাদির ওপর চিংড়ি না রেখে মসৃণ প্লাস্টিক সিটের ওপর রাখা।

৪.৩ গলদা চিংড়ি আহরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম

পুকুর বা জলাশয়ের আয়তন এবং চিংড়ি আহরণের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই আহরণের জাল বা ফাঁদ নির্বাচন করা হয়। গলদা চিংড়ি আহরণে সাধারণত নিম্নবর্ণিত সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

৪.৩.১ বেড় জাল: যদি পুকুর আয়তনে বড় হয় এবং বেশি পরিমাণে মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে বেড় জাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বেড় জালের ফাঁসের আকার ১/২ ইঞ্চি হওয়া উচিত। জাল উচ্চতায় পানির গভীরতার দ্বিগুণ এবং লম্বায় পুকুরের দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে দেড়গুণ হওয়া উচিত। একই পুকুরে একই দিনে দুবারের বেশি জাল টানা উচিত নয়। এতে মাছ ও চিংড়ির উপর চাপ পড়ে এবং ছোট মাছ ও চিংড়ি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যেতে পারে। জাল টানার পর যথাশীঘ্র বড় মাছ ও চিংড়ি ধরে ছোটগুলোকে ছেড়ে দেয়া উচিত।



চিত্র-৪.১: বেড় জাল দিয়ে চিংড়ি আহরণ

৪.৩.২ ঝাঁকি জাল: যদি স্বল্প পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি ধরতে হয় সেক্ষেত্রে ঝাঁকি জালই উত্তম। মাছ ও চিংড়ি ধরার ২০-২৫ মিনিট আগে পুকুরে খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থানে ৩-৫টি খাদ্য বল দিলে এদের ধরা সহজ হয়।



চিত্র-৪.২: ঝাঁকি জাল দিয়ে গলদা আহরণ

২০২৫

৪.৩.৩ ট্র্যাপ: ঘুনি, দুয়াড়, ধোছনা ইত্যাদি পেতে রেখে চিংড়ি আহরণ ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।



চিত্র-৪.৩: গলদা আহরণে ব্যবহৃত ট্রাপ

৪.৩.৪ পানি নিষ্কাশন: চিংড়ির আহরণের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পুকুরের সমস্ত পানি নিষ্কাশন করে চিংড়ি আহরণ করা হয়।

৪.৪ গলদা চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ির আহরণ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল। সে কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রায়শই প্রতিকুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম এবং উৎপাদিত পণ্যের আশানুরূপ দাম পেতে হলে পুকুর থেকে চিংড়ি আহরণের পর বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না। এতে দ্রুত চিংড়ির পচন ধরে এবং চিংড়ির গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। জীবিত অবস্থায় চিংড়ির খোলস, ফুলকা, পাকস্থলী ও দেহের অন্যান্য অংশে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া থাকে। কিন্তু চিংড়ি জীবিত থাকা অবস্থায় এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবে মারা যাওয়ার পর সাধারণ তাপমাত্রায় ব্যাক্টেরিয়া চিংড়িকে অতি দ্রুত আক্রমণ করে ফলে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এছাড়া সাধারণ তাপমাত্রায় চিংড়ির দেহস্থ প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে চিংড়ির পচন অধিক দ্রুত হয়। চিংড়ি আহরণোত্তর পরিচর্যাকালীন বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া হলো-

- ধরার পর চিংড়ি রোদে না রেখে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বা কোন চালার নিচে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা,
- পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত মসৃণ পাকা জায়গা অথবা প্লাস্টিক শিটের ওপর রাখা যাতে চিংড়ির গায়ে কোনো ময়লা, ঘাসের টুকরা ইত্যাদি লাগতে না পারে,
- পরিষ্কার ও শীতল পানিতে চিংড়ি ভালভাবে ধুয়ে শীতল করা,

২০২৫

- পরিষ্কার চিংড়ি বরফ ঠান্ডা পানির ট্যাংকে সর্বোচ্চ ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখা যাতে করে চিংড়ির শরীরের সব জায়গা বরফের মত ঠান্ডা হয়ে যায়,
- বরফ মিশ্রিত পানি থেকে চিংড়ি তুলে প্লাটফর্ম বা টেবিলের উপর রেখে চিংড়ি বাছাই করা,
- নরম খোলসযুক্ত চিংড়ি ও রোগাক্রান্ত চিংড়ি পৃথক করে ফেলা, এবং
- সুস্থ-সবল চিংড়ি আকার অনুসারে গ্রেডিং করা।

৪.৫ গলদা চিংড়ি বাছাই ও গ্রেডিং

পরিষ্কার পানিতে চিংড়ি ধোয়ার পর গ্রেড অনুযায়ী চিংড়ি বাছাই ও ওজন করা হয়। চিংড়ি বাছাই-এর ক্ষেত্রে চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ রয়েছে কী না তা পরীক্ষা করে নেয়া হয়। চিংড়ির গুণগতমান যথার্থ থাকা সত্ত্বেও যদি চিংড়ির খোলস ভেঙে যায় বা খোলসের রঙের পরিবর্তন হয়, তাহলে বাছাই করার সময় এ ধরনের চিংড়ি বাদ দেয়া হয়। নিম্নের ছকে গলদা চিংড়ির গ্রেডিং দেয়া হলো-

সারণিঃ গলদা চিংড়ির গ্রেডিং

গ্রেড	মাথাসহ প্রতি কেজিতে সংখ্যা	গ্রেড	মাথা ছাড়া প্রতি ৫০০ গ্রামে সংখ্যা
৫	৫ পর্যন্ত	৫	৫ পর্যন্ত
১০	৬-১০	৮	৬-৮
২০	১১-২০	১২	৯-১২
৩০	২১-৩০	২০	১৩-২০
৫০	৩১-৫০	৩০	২১-৩০

৪.৬ গলদা চিংড়ির প্যাকিং ও পরিবহণ পদ্ধতি

প্রাচীনকাল থেকেই মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহার করে পরিবহণ করা হয়। যেমন- কাঠের বাক্স, চামড়া ও কাপড়ের ব্যাগ, মাটির পাত্র ও বান্ডিল তৈরির জন্য রশি ইত্যাদি। যথাযথভাবে পণ্য সংরক্ষণ, সুষ্ঠ পরিবহণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে সহজতর করা ও সর্বোপরি পণ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই হলো প্যাকিং এর মূল উদ্দেশ্য। মৎস্য পণ্য পরিবহণ করার জন্য বর্তমানে ধাতুর তৈরি পাত্রের সাথে সাথে গ্লাস, কাগজ ও প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত তাজা চিংড়ি প্লাস্টিক বাক্স বা খাদযুক্ত বাক্সে প্যাকিং করে পরিবহণ করা হয়। প্লাস্টিক বাক্স হালকা, শক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত বিধায় বর্তমানে প্লাস্টিক বাক্সের ব্যবহার অত্যধিক।

অধিক পরিমাণে তাজা মাছ ও ফ্রোজেন চিংড়ি প্যাকিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত রেসিন করা কাগজের মন্ডের বাক্স ব্যবহার করা হয়। তবে ফাইবার বোর্ড বাক্স ও করোগেটেড বোর্ড কার্টুন বেশি ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলোর উপর পলিথিনে আবৃত থাকে। এছাড়া ব্লক ফ্রোজেন প্যাকিং এর ক্ষেত্রে খোলস ছাড়ানো চিংড়ি ফাইবার বোর্ড কার্টুন দিয়ে প্যাকেট করা হয়। সমস্ত প্যাকেটটি ফ্রোজেন করা হয় ফলে প্যাকেট পণ্যকে রক্ষা করে এবং শক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্লক ফ্রোজেন প্যাক খুব সহজেই সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা যায়। এ পদ্ধতির অসুবিধা হলো প্যাকেটের একটা চিংড়ি বের করতে হলে সমস্ত বরফ গলাতে হয়। তবে আইকিউএফ

(Individual Quick Freezing) পদ্ধতিতে চিংড়ি সংরক্ষণ খুচরা বিক্রেতা এবং সরবরাহকারীদের নিকট খুবই জনপ্রিয় কারণ এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী চিংড়ি বিক্রি ও সরবরাহ করা যায়। আইকিউএফ পদ্ধতিতে খোলস ছাড়ানো চিংড়ি ও মাছ প্যাকেট করা হয়। চিংড়ি পরিবহনকালীন বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো-

- বরফের পানিতে ঠান্ডা করা আস্ত চিংড়ি কুচি বরফের মধ্যে প্লাস্টিকের বাক্সে ইনস্যুলেটেড (তাপনিরাধেক) ট্রাক বা ভ্যানে পরিবহন করা;
- দিনের বেলায় সুর্যের আলো ও তাপের মধ্যে খোলা নৌকা, ভ্যানগাড়ী, রিকশা বা সাইকেলে চিংড়ি পরিবহন না করা;
- সব সময় চিংড়ির বাক্স ছায়াযুক্ত ঠান্ডা জায়গায় রাখা;
- পরিবহনে কত সময় লাগবে তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করা। সাধারণত চিংড়িও বরফের অনুপাত ১:১ হয়। দিনের তাপমাত্রাও এ ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়;
- পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন তাপ না লাগে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা;
- প্যাকিং সামগ্রী হিসেবে বাঁশের ঝুড়ি, হোগলা পাটি, চট ও কলাপাতা ব্যবহার না করা। এক্ষেত্রে ফুড গ্রেডেড প্লাস্টিকের বাস্কেট ব্যবহার করতে হবে;
- ধরার পর যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে চিংড়ি কারখানায় পৌঁছানো, এবং
- পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলা।

৪.৭ গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ পদ্ধতি

আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী বাছাইকৃত চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য সুবিধাজনক পরিবহন পাত্রে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। আহরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী সময়ে চিংড়িকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবহন বাক্সে বা পাত্রের তলায় এক স্তর বরফ দিয়ে তার ওপর একস্তর চিংড়ি সাজাতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বরফ ও চিংড়ি সাজানোর পরে সবার ওপরে পুরু করে একস্তর বরফ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। এভাবে চিংড়ি সাজানোর সময় খেয়াল রাখা উচিত যেন পাত্রে ২ ফুটের বেশি উচ্চতায় চিংড়ি সাজানো না হয়। কারণ এতে উপরের চিংড়ি ও বরফের চাপে নিচের চিংড়ি দৈহিক বা আকৃতিগত ক্ষতির আশংকা থাকে।

বাংলাদেশে সাধারণত বাজারজাতকরণের জন্য ডিপোতে বা অবতরণ কেন্দ্রে চিংড়ি বাজারজাতকরণ করে প্যাকিং করা হয়। পরিবহন দূরত্বের ওপর নির্ভর করেই সাধারণত বরফ ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পরিবহন সময়ের ওপর নির্ভর করে নিম্নহারে বরফ ব্যবহার করা হয়।

পরিবহন সময়	বরফ ও চিংড়ির অনুপাত
১২-১৮ ঘণ্টা	১-১
১৮-২৫ ঘণ্টা	১.৫-১
২৪-৪৮ ঘণ্টা	২-১

চিংড়ি পরিবহনের সময়ের সাথে সাথে তার গুণগতমান অনেকাংশেই বরফ টুকরার আকারের ওপর নির্ভরশীল। পরিবহন সময় অনুযায়ী বরফ টুকরার আকার নিচে দেয়া হলোঃ

পরিবহন সময়	বরফ টুকরায় আকার
১২ ঘন্টা	বরফ গুঁড়া/বরফকুচি
১২-২৪ ঘন্টা	ছোট/মাঝারি বরফ টুকরা

৪.৮ বাংলাদেশে চিংড়ির বিপণন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত চিংড়ির কোনো সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। ফলে চিংড়ি চাষি ও ক্রেতাদের মধ্যে বহু মধ্যবর্তী লোক বিপণনের সাথে জড়িত। এসব মধ্যস্বত্বভোগীদের চিংড়ির মতো একটি মূল্যবান সম্পদ সঠিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার ব্যাপারে কোন সঠিক জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক সময় উৎপাদিত পণ্য বিপণনের পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চিংড়ি চাষিরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। চিংড়ি সরাসরি পুকুর থেকে ফড়িয়া বা মধ্যবর্তী লোকদের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় চলে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ির মাথা ও খোসা ছাড়ানোসহ অন্যান্য পরিচর্যা করা হয়। এসময় চিংড়ি বিভিন্ন ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এভাবে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এবং নিম্নবর্ণিত কারণে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছানোর পূর্বেই চিংড়ির গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়-

- অসাবধানতাবশত: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ি আহরণ করা,
- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আহরণকৃত চিংড়ি সংরক্ষণ করা,
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরফের ব্যবহার না করা,
- চিংড়ি ধৌত করার কাজে অপরিষ্কার ও কর্দমাক্ত পানি ব্যবহার করা,
- খোলা আকাশের নিচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিংড়ির মাথা ছাড়ানো, খোসা ছাড়ানো প্রভৃতি কার্যাদি সম্পন্ন করা ও
- পরিবহনকালে অপরিষ্কার নোংরা যানবাহনে বহন করা, পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার না করা এবং বরফ ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা।

৪.৯ আহরণোত্তর গলদা চিংড়ির গুণগতমান সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

মূলত অণুজীবের কর্মতৎপরতা ও দেহাভ্যন্তরস্থ জৈব পদার্থে বিদ্যমান এনজাইমের বিক্রিয়ার ফলে চিংড়ির মৃত্যুর পর পচনক্রিয়া শুরু হয়। আর এ জন্য আহরণের পরপরই পচন রোধের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তাই চিংড়ি আহরণের পর যথাযথ পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ রহিতকরণ এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকরণের মাধ্যমে গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখা এবং সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া চিংড়ি পণ্যকে বাতাসের আর্দ্রতা, পোকা-মাকড়, ধুলা-বালি ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে প্যাকেজিং করা উচিত। ভালো প্যাকেজিং করে না রাখলে চিংড়ির গুণগতমান অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

৪.৯.১ চিংড়ির পচন ও পচনের কারণসমূহ

মাছ বা চিংড়ির মৃত্যুর পর যে প্রক্রিয়ায় এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যেমন- স্বাভাবিক গঠন, স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি ঘটে তাকে পচনক্রিয়া বলে। পচন দুইভাবে হতে পারে যথা: (১) রাসায়নিক পচন বা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পচন, এবং (২) ব্যাকটেরিয়াজনিত পচন।

(১) রাসায়নিক পচন বা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া পচন: এটি দুইভাবে হয়ে থাকে, যথা- দৈহিক এনজাইমঘটিত পচন ও র‌্যানসিডিটি। জীবিত অবস্থায় যেসব এনজাইম বিপাকীয় কাজে সহায়তা করে সেগুলো মাছের মৃত্যুর পর প্রোটিন, চর্বি ও কার্বোহাইড্রেট এর ব্যাপক ভাঙন ঘটায়, ফলে দেহে সাধারণ পচন শুরু হয়। এই পচনকে স্বয়ংক্রিয় পচনও বলে। দৈহিক এনজাইমের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপের মাধ্যমে পেশীকে দুর্বল করে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চর্বিযুক্ত মাছের ক্ষেত্রে এই ধরনের র‌্যানসিডিটি পচন ঘটে। মাছের চর্বি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এগুলো জারিত হয় ফলে মাছ হালকা খয়েরী বর্ণ ধারণ করে। র‌্যানসিডিটির ফলে অনেক সময় মাছের পেট ফেটে যায় এবং জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হতে থাকে।

(২) ব্যাকটেরিয়াজনিত পচন: সদ্য আহরিত চিংড়ির পেশিতে এবং দেহ রসে সাধারণত কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে না। তবে মাছ বা চিংড়ির ফুলকা, অন্তর ও ত্বকীয় শ্লেষ্মায় প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। ব্যাকটেরিয়া মাছ পচনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা মাছ বা চিংড়িকে খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী করে তোলে। জলীয় পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া সহজে বিস্তার লাভ করে। আহরণের সময়ই প্রচুর ব্যাকটেরিয়া মাছের দেহের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় লাভ করে। চিংড়ির পচনে সহায়ক কয়েকটি ব্যাকটেরিয়া হলো- অ্যারোমাব্যাক্টার, সিউডোমোনাস, ফ্লাভোব্যাকটেরিয়াম, মাইক্রোকক্কাস, অ্যারোমোনাস, ক্লস্টিডিয়াম ইত্যাদি।

৪.৯.২ চিংড়ির পচন রোধের উপায়সমূহ

চিংড়ি মানুষের কাছে একটি আকর্ষণীয় খাদ্য। কিন্তু আহরণের পর খুব সহজেই এর খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। আর এ জন্য আহরণের পরপরই পচন রোধের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে চিংড়ির পচন দুইটি কারণে ত্বরান্বিত হয়, যথা- সময় ও তাপমাত্রা। চিংড়ি আহরণের পর থেকে বাজারজাত বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যবর্তী সময় যত বেশি হবে চিংড়ির পচন তত বেশি হবে। সে কারণে চিংড়ি আহরণের পরে পরিবহন ও বাজারজাতকরণে যত কম সময় ব্যয় হয় ততই চিংড়ি বেশি টাটকা বা তাজা থাকবে। সুতরাং চিংড়ি সংরক্ষণের মূলনীতি হলো এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যার দ্বারা পচন সহায়ক কারণসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। চিংড়ির পচন রোধে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়।

ক) পরিচ্ছন্নতা: পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো আহরিত চিংড়ি যেন পচনশীল অন্য কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এসে দূষিত না হয় এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেন চিংড়িকে কলুষিত করতে না পারে। আহরিত চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্রে আনার সময় এদের খাদ্যনালী, দেহ গহবরে ও ফুলকায় প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। এছাড়া শরীরের বাহিরাংশে শ্লেষ্মায়ও প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। নড়াচড়া বা পরিচর্যাকালে ধুলাবালি, কাদা-ময়লা ও অপরিষ্কার পানি বা বরফ ইত্যাদির দ্বারা চিংড়ি কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ

পরিচর্যা চিংড়ির পচনকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং চিংড়িকে উত্তমরূপে ধৌতকরণে এবং ফুলকা ও অন্ত্র অপসারণের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব। সুতরাং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে মাছ বা চিংড়ির পচনকে অনেকটা কমানো যায়।

খ) ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপ রহিতকরণ: এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশলে চিংড়ির দেহের বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে থামিয়ে দিয়ে চিংড়িকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কৌশলসমূহ নিম্নরূপ-

পচন রোধে নিম্ন তাপের ব্যবহারঃ বরফ দিয়ে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিংড়ির দেহের তাপমাত্রা হ্রাসের মাধ্যমে এনজাইম ও ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা ব্যাহত করা হয়। যেমন- শীতলীকরণ ও হিমায়িতকরণ।

আর্দ্রতা অপসারণের মাধ্যমে পচন রোধঃ এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মাছের দেহের পানি অপসারণ বা কমিয়ে ফেলা হয়। এটা প্রাকৃতিকভাবে যেমন- সূর্যালোকে বা কৃত্রিম উপায়ে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে করা হয়। চিংড়ির শরীরের আর্দ্রতা এমন এক মাত্রায় কমানো হয় যেখানে ব্যাকটেরিয়া ও এনজাইমের কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন- লবণায়ন, শুষ্ককরণ বা শুটকিকরণ, ধূমায়িতকরণ ও নিরুদিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে চিংড়ির পচন রোধ করা যায়।

সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে পচন রোধঃ বিভিন্ন সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়িকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় বা সংরক্ষিত চিংড়ির সংরক্ষণ সময় দীর্ঘায়িত করা যায়। চিংড়ির সংরক্ষক হিসেবে ভিনেগার ও লবণ ব্যবহার করা হয়। তাজা বা হিমায়িত চিংড়ি সাধারণ তাপমাত্রায় এনে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এ চিংড়িকে ৫-১০% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ১০-১৫% লবণের দ্রবণে এক সপ্তাহ বা বেশি সময় ডুবিয়ে রাখা হয়। এ অবস্থায় চিংড়ির আমিষ জমাট বেঁধে যায়। এসব চিংড়ি তখন ১-২% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ২-৪% লবণ দ্রবণে চূড়ান্তভাবে বোতলজাত করা হয়। এভাবে বোতলজাত চিংড়িকে ০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় কমপক্ষে ৩ মাস ভালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

গ) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ: এই পদ্ধতিতে আহরিত মাছ বা চিংড়িকে পরবর্তীকালে ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে গুণগতমান সম্পন্ন রাখার জন্য উচ্চ তাপমাত্রায় বায়ুরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিকে টিনজাতকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, মোল্ড সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয় এবং বায়ুরোধক পাত্রে রাখার কারণে নতুন করে কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া প্রবেশের সুযোগ পায় না। এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত মাছ বা চিংড়ির স্বাভাবিক মৌলিক স্বাদের কিছুটা পরিবর্তন হলেও গুণাগুণের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

৪.৯.৩ নিম্ন তাপমাত্রায় চিংড়ি সংরক্ষণের প্রকারভেদ

তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করে নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

৪.৯.৩.১ শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতি

স্বল্প সময়ের জন্য চিংড়ির সজীবতা রক্ষার্থে শীতলীকরণ অত্যন্ত সুবিধাজনক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চিংড়ির তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি আনা হয়, তবে হিমাঙ্কের নিচে নয়। এ পদ্ধতি খুব দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণে শীতলীকরণ পদ্ধতি অনুপযোগী। আহরণের পরপরই যদি চিংড়িকে অন্তর্বর্তীকালীন সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়, যেমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ, অবতরণ কেন্দ্র থেকে বাজারে বা প্রক্রিয়াজাত কারখানায় প্রেরণের প্রয়োজন হয় তবে এ পদ্ধতি অবলম্বনে ভালো ফল পাওয়া যায়। শীতলীকরণের প্রধান লক্ষ্য হলো মাছের তাপমাত্রাকে ০ ডিগ্রি সে. এর কাছাকাছি নিয়ে আসা। শীতলীকরণের উপায়সমূহ হলো-

ক) বরফ ব্যবহার করেঃ নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। স্বাদু পানি থেকে উৎপাদিত টুকরো বা গুঁড়ো বরফ ব্যবহার করে চিংড়িকে আচ্ছাদিত করা হয়। ফলে মাছের পচন সাময়িকভাবে রোধ করা যায়। কারণ সঠিকভাবে চিংড়ির তাপমাত্রা (০° সে. - ৪ ডিগ্রি সে.) কমিয়ে আনার ফলে এনজাইম, জারণ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত পরিবর্তন কমিয়ে দেয় এবং বরফগলা পানি চিংড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত করে এবং ব্যাকটেরিয়া, রক্ত, শ্লেষ্মা ইত্যাদি ধৌত করে।

খ) সংরক্ষক ও বরফ ব্যবহার করেঃ অনেক সময় সংরক্ষিত মাছের গুণাগুণ ভালো রাখার জন্য ও বরফের গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য বরফের সাথে কিছু ব্যাকটেরিয়ানাশক বা অন্য যে কোনো ধরনের সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যগুলারে নাম হলো- সোডিয়াম বেনজোয়েট, ফিউমারিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই অক্সাইড, ডাই সোডিয়াম ফসফেট, বেনজোয়িক অ্যাসিড, সোডিয়াম নাইট্রাইট, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ইত্যাদি।

গ) শীতল সামুদ্রিক পানি ব্যবহার করেঃ বরফ ব্যবহারের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে ঠান্ডা সামুদ্রিক পানিতে চিংড়িকে ডুবিয়ে রেখে শীতলীকরণ করা যায়। সামুদ্রিক ট্রলারে এই পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। ট্রলারের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক পাত্র বা ট্যাংকে সমুদ্রের পানি যান্ত্রিকভাবে কমপ্রেসর এবং কুলিং পাইপের সাহায্যে বা বরফ মিশ্রিত করে ২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় নিয়ে আসা হয়। বৃহৎ ফ্রিজিং ট্রলারে আহরিত মাছকে হিমায়িতকরণের পূর্বে এভাবে শীতলীকরণ করা হয়।

৪.৯.৩.২ হিমায়িত প্রক্রিয়ায় চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতি

হিমায়িতকরণ পদ্ধতি শীতলীকরণ পদ্ধতি হতে অধিক কার্যকর। চিংড়িকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। হিমায়িতকরণ পদ্ধতিতে মাছ বা মৎস্যজাত দ্রব্যের দেহের তাপমাত্রা হিমায়ন যন্ত্র ব্যবহার করে -৮ ডিগ্রি সে. বা তারও কম রাখা হয়। সাধারণত চিংড়িকে -৩০ ডিগ্রি সে. থেকে -৪০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়।

মাছের শরীরে প্রচুর পানি থাকে যা ০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হয় না। কারণ এ পানির সাথে লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থাকে। মাইনাস ১ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় মাছের দেহের পানি জমতে শুরু করে এবং মাইনাস ৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় প্রায় ৮০% পানি বরফে পরিণত হয়। এ অবস্থায় অহিমায়িত

পানিতে লবণের ঘনত্ব ক্রমে বাড়তে থাকে। ফলে মাছ পূর্ণ হিমায়িত হতে আরও বেশি তাপমাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় ও মাছের ভিতরের ১০% পানি অহিমায়িত থাকে, বিধায় মাইনাস ৩৫-৪০° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়। চিংড়ি হিমায়িতকরণে তিনটি স্তরে তাপমাত্রা নিচের দিকে নামে।

প্রথম স্তরে তাপমাত্রা খুব দ্রুত এবং ভালভাবে ০ ডিগ্রি সে. বা এর সামান্য নিচ পর্যন্ত নামে। দ্বিতীয় স্তরে তাপমাত্রা ০° থেকে -১৭°সে.পর্যন্ত নামে ঐখানে প্রায় স্থির থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে তাপমাত্রা আরও নিচে নামে এবং অবশিষ্ট অহিমায়িত অংশ হিমায়িত হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হিমায়িতকরণের দ্বিতীয় স্তরে, সবচেয়ে সময় বেশি লাগে এবং ঐ সময়ে তাপমাত্রা সহজে নিচে নামে না বা খুব সামান্য নিচে নামে। এই স্তর বা সময়টাকে হিমায়িতকরণের সংকটকাল বলা হয়। কারণ ভালোভাবে চিংড়িকে হিমায়িত করতে হলে এ সময়টা অতি দ্রুত অতিক্রম করতে হবে। তা না হলে হিমায়িত চিংড়ির গুণাগুণে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। তৃতীয় স্তরে এসে তাপমাত্রা আরও নিচে নামে এবং অবশিষ্ট অহিমায়িত অংশ হিমায়িত হয়।

৪.৯.৩.৩ হিমায়ক যন্ত্রের প্রকারভেদ

মাছ বা চিংড়ির হিমায়িতকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্র বা ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি হিমায়ক যন্ত্রের বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার: এ ধরণের ফ্রিজারের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের বাস্প প্রবাহিত করে মাছ বা অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যকে হিমায়িত করা হয়। এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

(১) অনবরত ফ্রিজার: এ প্রকার ফ্রিজারে হিমায়িতকরণের সময় দ্রব্য বা Product ঘুরতে থাকে। হিমায়কের ভিতর এক পাশ থেকে মাছ বা দ্রব্যাদি ঢুকানো হয় এবং অন্য পাশ দিয়ে হিমায়িত উপাদান বের করা হয়।

(২) ব্যাচ ফ্রিজার: ব্যাচ ফ্রিজারে মাছ বা চিংড়ি বা দ্রব্য প্রবেশ করানো হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখে হিমায়িত করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ফ্রিজারের মধ্যে এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ এর ব্যবহারে সুবিধাগুলো হচ্ছে- এ জাতীয় ফ্রিজার বহমুখী কাজে ব্যবহার করা হয়, এ জাতীয় ফ্রিজারে হিমায়িতকরণে কম খরচ করা হয় এবং হিমায়তকরণের সময় কম পরিচর্যা করলেই চলে।

খ) কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার: এ ধরনের হিমায়ক যন্ত্রে চিংড়িকে সরাসরি হিমায়িত প্লেটের ওপর রেখে হিমায়িত করা হয়। কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার চার প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন- প্লেট ফ্রিজার, ব্যান্ড ফ্রিজার, রোটারি ফ্রিজার এবং ড্রাম ফ্রিজার। এগুলোর মধ্যে প্লেট ফ্রিজার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ফ্রিজারে চিংড়িকে ফাঁপা ধাতুর প্লেটের মধ্যে রাখা হয় যার মধ্যে শীতলীকরণের জন্য রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার তাপ নিরোধক পৃথক রুমে (Insulated room) স্থাপিত থাকে যেখানে মাছকে প্যাকেট বা ব্লক সংযুক্ত আকারে হিমায়িত করা হয়। প্রতিটি মাছ বা চিংড়ির ব্লক

৫০-৬০ মিলিমিটার পুরু হয়। ব্লক তৈরির জন্য প্লেটগুলোতে সংযুক্ত পাম্পের সাহায্যে ঠান্ডা লবণ পানি (Cold brine), অ্যামোনিয়া বা রেফ্রিজারেন্ট ১২ বা ২২ প্রবাহিত করা হয়। ফলে মেটাল প্লেটের তাপমাত্রা ৩৫-৪০ ডিগ্রি সৈ. হয়ে থাকে। মৎস্যজাত দ্রব্য দ্রুত হিমায়িতকরণের জন্য কন্ট্যাক্ট প্লেট ফ্রিজার ব্যবহার করা হয়। সাধারণত চিংড়ি ও অন্যান্য ছোট ছোট মাছ ব্লক আকারে এই প্রকার ফ্রিজে হিমায়িত করা হয়।

গ) ইমারসন ফ্রিজার: এ ক্ষেত্রে মাছকে নিম্ন তাপমাত্রায় তরল পদার্থে ডুবানো বা নিমজ্জিত করা হয়। এভাবে সরাসরি ঠান্ডা তরলের মধ্যে রেখে মাছের দেহের তাপমাত্রা কমানোর পদ্ধতি এয়ার ব্লাস্ট ফ্রিজারে ঠান্ডা বাতাস প্রয়োগ থেকে উৎকৃষ্ট। পানির ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তরল পদার্থের ফ্রিজিং পয়েন্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ইমারসন ফ্রিজারের কোনো আদর্শ নকশা নেই এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের জন্য বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। সাধারণত ঠান্ডা লবণ পানি অথবা কোন রেফ্রিজারেন্ট বাষ্পকে পাম্প এর সাহায্যে ক্রমাগত মৎস্যজাত দ্রব্যের ওপর প্রবাহিত করা হয় অথবা মৎস্যজাত দ্রব্যকে একমুখী ঠান্ডা দ্রবণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। মাছ ধরার ট্রলারে চিংড়ি হিমায়িতকরণে ইদানিংকালে লবণ পানির দ্রবণের সাথে ২০% গ্লুকোজ এবং ২০% খাবার লবণ যোগ করে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইমারসন ফ্রিজারে মাছ ধরার ট্রলারে প্যাকেটকৃত নয় (Unpacked) এমন মাছের হিমায়িতকরণের জন্য উপযুক্ত।

ঘ) শার্প ফ্রিজার: শার্প ফ্রিজার একটি পৃথক ইনসুলেটেড বা তাপ নিরোধক ঘর যার তাপমাত্রা -২৫ ডিগ্রি সে. রাখা হয়। এ ফ্রিজারে বিভিন্ন আকারের কয়েল দ্বারা তৈরি সেলফ থাকে যার ভিতর দিয়ে ঠান্ডা লবণ পানি, অ্যামোনিয়া বা অন্যান্য রেফ্রিজারেন্ট প্রবাহিত করা হয়। হিমায়িতকরণের সময় মাছ বা চিংড়িকে সরাসরি সেলফে বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি প্যানের ওপর রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে তাপমাত্রার পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয়। কারণ মৎস্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ উপরিভাগ (surface) ফ্রিজারের পাইপের সংস্পর্শে থাকতে পারে না এবং ফ্রিজারের ভিতর বায়ু চলাচল সীমিত। এ প্রকার হিমায়ন পদ্ধতি ধীরগতি সম্পন্ন ও পুরাতন বিধায় এর ব্যবহার বর্তমানে অত্যন্ত সীমিত।

৪.১০ গলদা চিংড়ি প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ

মাছ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যের আসল গুণাগুণ ধরে রাখা এবং কোনরূপ কলুষিতকরণ ও সংক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য কোন দ্রব্যাদি দ্বারা মাছ বা খাদ্য দ্রব্যকে মোড়ানোর পদ্ধতিকে প্যাকেটজাতকরণ বলা হয়। আধুনিক বিপণন ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপায়ে পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাত করার পর মাছ ও মৎস্য জাত দ্রব্যকে সংরক্ষণ, নিরাপদ ও সহজ পরিবহন এবং পরবর্তীতে কোনরূপে কলুষিত বা সংক্রমিত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্যাকেটজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্যাকেটজাতকরণের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

(১) ধারক হিসেবে কাজ করে,

(২) বিভিন্নভাবে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে,

(৩) উপযোগ সৃষ্টি করে, এবং

(৪) ভোক্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২০২৫

চিংড়ি পণ্য বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়েও গুণগতমান হারাতে পারে। চিংড়ি পণ্য বাজারজাত করার জন্য স্থানান্তরের সময় বা বাজারজাতকরণের পরে বিক্রেতার দোকানে অসাবধানতার কারণে চিংড়ি পণ্যের প্যাকেট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও চিংড়ি পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হতে পারে। দোকানে দীর্ঘ দিন অবিক্রিত রয়ে গেল চিংড়ি পণ্যের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। কাজেই বাজারজাতকরণের সময়ে ও তৎপরবর্তী বিক্রয়ের সময়ে বিশেষভাবে চিংড়ি পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

৪.১১ চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত চিংড়ি পণ্যের খবর ক্রেতার নিকট পৌঁছানো অতি জরুরি। চিংড়ি পণ্যের ভোক্তারা সাধারণভাবে চিংড়ি পণ্যের স্বাদের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। চিংড়ি পণ্যের সকল ক্ষেত্রে হ্যাসাপ মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি কিনা সে ব্যাপারে সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মৎস্যজাত খাদ্যে যে জীবাণুগত সমস্যা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে তা মাননিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী বিশ্বে বাজারজাত করা সহজ হবে। এই হ্যাসাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১০০ ভাগ খাদ্যসামগ্রীকে অণুজীবঘটিত রোগের সংক্রমণ থেকে রোধ করা সম্ভব। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যে বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ খাদ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা একমত পোষণ করেন যে, খাদ্য উৎপাদনের উৎসস্থল থেকে যে সকল কারণে খাদ্য সংক্রমিত হচ্ছে তা নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং সুন্দর জীবন উপহার দেয়া সম্ভব।

৪.১২ চিংড়ির গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে হ্যাসাপ পদ্ধতি

'হ্যাজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট' এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে হ্যাসাপ (HACCP)। কোনো খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্য এটি হচ্ছে একটি আধুনিক পদ্ধতি। কোনো খাদ্যপণ্যের কাঁচামালের উৎসস্থল থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে সম্ভাব্য ক্ষতিকর পদার্থ, জীবগত ও রাসায়নিক বিষয়গুলোকে (হ্যাজার্ড) এ পদ্ধতির সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি ধাপে চিহ্নিত হ্যাজার্ডগুলোকে প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেয়া হয়। এরপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলোর হ্যাজার্ড প্রতিরোধের সক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট হ্যাজার্ডগুলোর দ্বারা বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনাগুলোর নিরিখে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন কোন ধাপ সংকটপূর্ণ তা চিহ্নিত করে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত ধাপেই বিশেষ নিয়ন্ত্রণ কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়।

চিংড়িতে ক্ষতিকর জীবাণু, কীটনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া গেলে আমদানিকারক দেশগুলো এরকম চিংড়ি গ্রহণ করে না। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত চিংড়ির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এদেশ থেকে রপ্তানিকৃত চিংড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু, নোংরা ও ময়লা বস্তু এবং বিভিন্ন অপদ্রব্যের উপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের চিংড়িকে সাধারণত নিম্নমানের চিংড়ি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে চিংড়ির চাষ পর্যায়ে রাসায়নিক ও জীবগত হ্যাজার্ড সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। চিংড়ি চাষ এবং পরিবেশের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমানে বিশেষজ্ঞগণ চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত মৎস্য পণ্যে এমন সব ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ এবং অণুজীবের উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে যেগুলোর প্রয়োগ ও সংক্রমণ চাষ পর্যায়েই ঘটার সম্ভাবনা বেশি। তাই চিংড়িতে নাইট্রোফুরান ও ক্লোরামফেনিকল নামক ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক এবং টাইফয়েড ও কলেরার ন্যায় মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপস্থিতির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। চিংড়িতে উক্ত ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক ও জীবাণুর উপস্থিতির কারণে প্রতিবছর রপ্তানিকৃত বেশ কিছু পরিমাণ চিংড়ি বিদেশ থেকে ফেরৎ আসে। ফলে একদিকে রপ্তানিকারকগণ যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তেমনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। তাই এ আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মাছ ও চিংড়ির চাষ পর্যায়ে হ্যাসাপ নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসন্ধানমূলক কাজ-১

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেকোন একটি চিংড়ি ঘের/পুকুর পরিদর্শন কর যেখানে নিয়মিত জাল টেনে চিংড়ি আহরণ করা হয়। আহরিত চিংড়ি কিভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে তা পরিদর্শন কর এবং এর কর্ম পরিবেশ ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত মৎস্য খামারের নাম	
ঠিকানা	
কি কি উপায়ে চিংড়ি আহরণ করা হয়?	১. ২.
চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে কি কি আহরণ সরঞ্জামাদি বা গিয়ার ব্যবহার করা হয়?	১. ২.
চিংড়ি আহরণের পূর্বে আহরণ পূর্ববর্তী কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?	১. ২.
কর্মী সংখ্যা কত?	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে?	১. ২.
চিংড়ি খামারের পরিবেশ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও	১. ২. ৩.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

অনুসন্ধানমূলক কাজ-২

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেকোন একটি চিংড়ি কারখানা পরিদর্শন কর যেখানে মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন-চিংড়ি বাছাইকরণ, বরফ পানি দ্বারা চিংড়ি ধৌতকরণ, খোসা অবমুক্তকরণ ইত্যাদি কাজ গুলো পর্যবেক্ষন এবং পরিদর্শন শেষে এর কর্ম পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নের ছকে তোমার মতামত দাও।

পরিদর্শনকৃত চিংড়ি কারখানার নাম	
ঠিকানা	
কিভাবে চিংড়ি বাছাই করা হয়?	১. ২.
চিংড়ি বাছাই করার সময় কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়?	১. ২.
বরফ পানি দ্বারা চিংড়ি কিভাবে ধৌত করা হয়?	১. ২.
চিংড়ি কিভাবে গ্রেডিং করা হয়?	১. ২.
চিংড়ির খোসা অবমুক্ত করতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়?	১. ২.
কর্মী সংখ্যা কত?	
কর্মীগণ কাজের সময় কি কি ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে?	১. ২.
চিংড়ি কারখানার পরিবেশ সম্পর্কে মতামত দাও	১. ২. ৩.
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নং	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
প্রতিবেদন জমাদানের তারিখ	শিক্ষকের স্বাক্ষর

২০২৫

জব ১: চাষকৃত গলদা চিংড়ি আহরণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- গলদা চিংড়ি ধরার জন্য ঘের বা পুকুরের কোন পাড় থেকে জাল নামানো হবে এবং কোন পাড়ে উঠবে তা নির্ধারণ করা
- চিংড়ি ধরার উপকরণ সংগ্রহ করা
- সঠিক পদ্ধতিতে জাল টানা
- বিক্রয় উপযুক্ত চিংড়ি গুলোকে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পরিচর্যা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গগলস	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া
০৪	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
০৬	লাইফ জ্যাকেট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	৬ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	গামছা	মাঝারি মাপের	১ টি
০৪	বেড় জাল	নাইলন সুতার, পুকুরের মাপ মতো	১ টি
০৫	ঝাঁকি জাল	নাইলন সুতার, মেস সাইজ ১/২ ইঞ্চি	৪টি
০৬	পানির পাম্প	২-১০ অশ্ব ক্ষমতার	২টি
০৭	হাপা	নাইলনের রশি	১টি
০৮	ডিজিটাল ব্যালেন্স	১.০-৫০.০ কেজি পর্যন্ত	১টি

০৯	চিংড়ি রাখার ঝুঁড়ি বা ক্যারেট	প্লাস্টিকের (২০ - ৫০ কেজি)	৪টি
১০	খাতা	প্রয়োজনমত	১টি
১১	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	১টি

(গ) কাজের ধারা

১। নিকটস্থ কোন গলদা চিংড়ির পুকুরের পাড়ে যাও।

২। বেড় জাল দিয়ে সমস্ত ঘের বা পুকুরের চিংড়ি টেনে এক জায়গায় নিয়ে আসো।

৩। এবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়ে বেড় জাল দিয়ে যতটা সম্ভব চিংড়ি ধরে ফেলো।

৪। এবার পাম্প মেশিন দিয়ে পুকুরের পানি সম্পূর্ণ রুপে নিষ্কাশন করে ফেলো।

৫। অত:পর হাত দিয়ে ছোট বড় সব চিংড়ি ধরে ফেলো।

৬। আহরিত চিংড়ি ঝুঁড়িতে রাখো।

৭। আহরণকৃত চিংড়ির ওজন, দাম, জেলের পারিশ্রমিক ইত্যাদি রেকর্ড বইতে লিখে রাখো।

৮। গৃহীত কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রতিবেদন ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- সঠিক সময়ে চিংড়ি ও মাছ ধরতে হবে। আর সেই কাজটা খুব সকালে ঠান্ডা আবহাওয়াতে করা উত্তম, কারন চিংড়ি ও মাছ ধরার সময় পুকুরের অন্যান্য চিংড়ি ও মাছের উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে, চিংড়ি ও মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয় বিধায় অধিক তাপমাত্রায় আংশিক মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা উচিত।
- চিংড়ি চাষের পরিকল্পিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতিতে চিংড়ি আহরণ করা হয়।
- অমাবস্যা-পূর্ণিমার তিথিতে সুর্যাস্ত ও সুর্যোদয়ের সময় চিংড়ি সহজেই আহরণ করা যায় সেই দিকে খেয়াল রাখে চিংড়ি আহরণে মনযোগী হওয়া।

আত্মপ্রতিফলন

ঘের বা পুকুরের চিংড়ি ধরার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ২: আহরিত গলদা চিংড়ি বাছাই করণে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করা
- গলদা চিংড়ি ধরার পর তা রৌদ্রে না রেখে ঘরের ভিতর ছায়াযুক্ত স্থানে বা চালার নিচে ছায়াতে রাখো।
- চিংড়ি ধরার মসৃন জায়গাতে রেখে বাছাই করার সঠিক স্থান নির্ধারণ করা
- সঠিক পদ্ধতিতে বাছাই করা
- স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পরিচর্যা করা
- কাজ শেষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উপকরণ যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
- কাজ শেষে সুরক্ষা পোশাক ও উপকরণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী জমা দেওয়া

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১ টি
০২	গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	গগলস	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া
০৪	গামবুট	শিক্ষার্থীর মাপমতো	১ জোড়া
০৫	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি	২০-৩০ লিটার	৬ টি
০২	বালতি	১৫-২০ লিটার	২ টি
০৩	গামছা	মাঝারি মাপের জনপ্রতি	১ টি
০৪	লম্বা মসৃন টেবিল	কাঠের বা স্টিলের (১০-১৫ ফুট লম্বা)	২ টি
০৫	ঠান্ডা পানি	০° সে. তাপমাত্রার	পরিমান মতো
০৬	ডিজিটাল ব্যালেন্স	১.০-৫০.০ কেজি পর্যন্ত	১টি
০৭	চিংড়ি রাখার ঝুঁড়ি বা ক্যারেট	প্লাস্টিকের (২০ - ৫০ কেজি)	৪টি
০৮	খাতা	প্রয়োজনমত	১টি
০৯	পেন্সিল	প্রয়োজনমত	১টি
১০	রাবার চট	প্রমাণ সাইজের	২টি
১১	ট্রে	স্টিলের (৩ফুট×৪ফুট)	৬টি
১২	প্লাস্টিকের ড্রাম	মসৃন প্লাস্টিক	৪টি

(গ) কাজের ধারা

১। চিংড়ি ধরার পর পরই ছায়াযুক্ত স্থানে চাটাই বা পলিথিন পেপারের উপর রাখো।

২। এবার চিংড়ি গুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করো।

৩। পরিস্কার পানি দিয়ে ধৌত চিংড়ি গুলোকে এবার ড্রামের ভেতর বরফ মিশ্রিত পানিতে রাখো।

৪। এবার চিংড়ি গুলোকে বরফ থেকে তুলে ট্রেতে রাখো।

৫। অতঃপর চিংড়িগুলো বিভিন্ন গ্রেডে বাছাই করো।

৬। গ্রেড অনুযায়ী চিংড়িগুলো বিভিন্ন ট্রেতে সঠিক নিয়মে বরফ ও চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও।

৭। ট্রেতে স্তরে স্তরে সাজানো চিংড়িগুলোকে ভেজা চট দিয়ে ঢেকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখো।

৮। প্রাথমিক ধৌতকরণ ও গ্রেডিং এর পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লেখ।

সতর্কতা

- তাপমাত্রা বেশি থাকলে আহরণের প্রথম ৩ ঘন্টার মধ্যেই চিংড়ির গুণগত অবস্থার বেশি অবনতি ঘটে। এ অবস্থা রোধ কল্পে অল্প পরিমাণ চিংড়ি আহরণপূর্বক ঠান্ডা পানি দিয়ে ধৌত করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য চিংড়ির গ্রেডিং যথাযথ ভাবে হওয়া একান্ত দরকার। এজন্য আহরিত চিংড়ি খামার থেকেই সঠিকভাবে গ্রেডিং করে বাজারজাত করণের জন্য প্যাকিং করতে হবে।

আত্মপ্রতিফলন

আহরিত চিংড়ি বাছাই করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৩: সনাতন পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ কৌশলে দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণের মালামাল সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাঝারী মাপের	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	বরফ ভাঙ্গা মেশিন	২ অশ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন	১ টি
০২	হাতুরি	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৩	মুগুড়	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৪	মিটার স্কেল	১ মিটার	১টি
০৫	যে কোন প্রজাতির মাছ	টাটকা বা তাজা	১০টি বা ৫ কেজি
০৬	বরফ	ভালো মানের	১ পাটা বা ২০ কেজি
০৭	বাঁশের ঝুঁড়ি বা টুকরি	মাঝারী আকারের	১ টি
০৮	হোগলার মাদুর অথবা চট	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০৯	রশি	পরিমাণ মত	৫০০ গ্রাম
১০	গামছা	মাঝারী আকারের	১ টি
১১	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু	১ টি
১২	খাতা, পেন্সিল	প্রয়োজন মত	

(গ) কাজের ধারা

১. প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ (ঝুঁড়ির আকার অনুযায়ী) টাটকা বা তাজা গলদা চিংড়ি সংগ্রহ করো।

২. গলদা চিংড়ির ওজনের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুঁড়া অথবা ব্লক বরফ সংগ্রহ করে ঝুড়িতে বরফ এবং গলদা চিংড়ি স্তরে স্তরে সাজাও।

৩. ব্লক বরফ এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের পূর্বে হাতুড়ি কিংবা কাঠের টুকরার সাহায্যে চটের ব্যাগের মধ্যে রেখে গুঁড়া করো।

৪. ঝুড়িটি পরিষ্কার পানিতে ধোয়ার পর প্রথমে ঝুড়ির ভিতরের চারিদিকে চটের একটি আস্তরণ দাও। অতপর ঝুড়ির তলায় ২ ইঞ্চি পুরু বরফের একটি স্তর দাও।

৫. তারপর এক স্তর গলদা চিংড়ি এবং এক স্তর বরফ এভাবে সাজিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করো।

৬. ঝুড়ি পূর্ণ হবার পর এক স্তর বরফ দিয়ে তার উপর চটের টুকরা দিয়ে চেপে সেলাই করে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করো।

৭. অনুশীলনকৃত কার্যক্রমটি খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সতর্কতা

- শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য এ পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ কার্যকর।
- ঋতু ভেদে গলদা চিংড়ি ও বরফের অনুপাত কম বেশি হবে। গ্রীষ্মকালে বরফ এবং চিংড়ির অনুপাত হবে ১ : ১ এবং শীতকালীন সময়ে বরফ এবং চিংড়ির অনুপাত হবে ১ : ২।
- গলদা চিংড়ি সংরক্ষণে ব্যবহৃত বরফের টুকরোগুলো যেন অবশ্যই ছোট হয়।

আত্মপ্রতিফলন

সনাতন পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

জব ৪: আধুনিক পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা চিংড়ি সংরক্ষণ কৌশল

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোষাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী টুলস্, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন এবং সংগ্রহ করা
- প্রয়োজন অনুয়ায়ী আধুনিক পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা মাছ সংরক্ষণের মালামাল সংগ্রহ করা
- কাজ শেষে কাজের স্থান পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
- কাজের শেষে চেক লিষ্ট অনুয়ায়ী ব্যবহৃত টুলস্ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে ধুয়ে, মুছে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা।

(ক) ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম

ক্রম.	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	পিপিই	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০২	হ্যান্ড গ্লাভস্	মাপমতো	১ জোড়া
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি

(খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ

ক্রম.	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	বরফ ভাঙ্গা মেশিন	২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন	১ টি
০২	হাতুরি	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০৩	মুগুড়	প্রমাণ সাইজ	১ টি
০৪	মিটার স্কেল	১ মিটার	১ টি
০৫	চিংড়ি	টাটকা বা তাজা	১০টি/ ১০ কেজি
০৬	বরফ	ভাল মানের	১ পাটা/ ২০ কেজি
০৭	বাঁশের ঝুড়ি/টুকরি	প্রমাণ সাইজ	১টি
০৮	প্লাস্টিক পাইপ	প্রমাণ সাইজ	৫ গজ
০৯	হোগলার পাটি অথবা চট	পরিমাণ মত	১ টি
১০	রশি	প্রমাণ সাইজ	৫০০ গ্রাম

১১	গামছা	মাঝারি আকারের	১টি
১২	টিস্যু পেপার	কিচেন টিস্যু	১টি
১৩	পলিথিন পেপার	ভালো মানের	৫ গজ
১৪	খাতা, পেন্সিল	প্রয়োজন মত	১টি

(গ) কাজের ধারা

১. এই ক্ষেত্রে প্রথমে প্রমাণ সাইজের (২০-৩০ কেজি) বাঁশের ঝুড়ির ভিতরের দিকটা প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে সেলাই করে মুড়ে দাও। চটের কিছু অংশ বাড়তি থাকবে।

২. চট দিয়ে মোড়ানোর পর ঝুড়ির ভিতরে এমনভাবে হোগলার পাটি বিছিয়ে দাও যাতে হোগলার কিছু অংশ বাড়তি থাকে।

৩. হোগলার উপর আর এক প্রস্থ প্লাস্টিকের বস্তা পূর্বের ন্যায় সেলাই করে দাও।

৪. এবার সেলাই করা প্লাস্টিকের উপর পাতলা পলিথিন শিট বিছিয়ে দাও ।

৫. প্রথমে পলিথিন শিটের উপর এক স্তর বরফ রেখে গলদা চিংড়ি সাজিয়ে দাও। এর পর ভাঁজে ভাঁজে বরফ ও গলদা চিংড়ি স্তর সাজিয়ে উপরে অতিরিক্ত বরফ দিয়ে বাড়তি চট, হোগলা ও পলিথিন শিট এক সাথে মুড়ে ঝুড়ির মুখ বাঁধো।

৬. এই ধরণের ঝুঁড়ির ক্ষেত্রে ঝুড়ির তলায় বরফ গলা পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য ছিদ্র থাকে। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে বাঁশের ঝুঁড়িতে গলদা চিংড়ি পরিবহনের সময় ছিদ্র না থাকার কারণে বরফ গলা পানি সমস্যা সৃষ্টি করে।

৭. এই পদ্ধতিতে ঝুঁড়ির তলার পলিথিন, হোগলা ও প্লাস্টিকের চট ছিদ্র করে ১ সে.মি. ব্যাসের ২ ফুট লম্বা একটি প্লাস্টিকের নল ঢুকিয়ে শক্ত করে বেঁধে দাও। এবার নলের অপর প্রান্ত বাঁকিয়ে ঝুড়ির উপরের দিকে এক প্রান্তে বেধে রাখো।

৮. এইভাবে বরফ দেয়া গলদা চিংড়ি ২৪ ঘণ্টা পুনরায় বরফ না দিয়েও গুণাগুণ যথাযথ রেখে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি ২৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর একবার করে গলদা চিংড়ি উপর সামান্য বরফ দাও।

সতর্কতা

- ৪-৫ দিনের জন্য এ পদ্ধতিতে গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ কার্যকর।
- ঋতু ভেদে চিংড়ি ও বরফের অনুপাত কম বেশি হবে। গ্রীষ্মকালে বরফ এবং চিংড়ির অনুপাত হবে ১ : ১ এবং শীতকালীন সময়ে বরফ এবং চিংড়ির অনুপাত হবে ১ : ২।
- গলদা চিংড়ি সংরক্ষণে ব্যবহৃত বরফের টুকরোগুলো যেন অবশ্যই ছোট হয়।

আত্মপ্রতিফলন

আধুনিক পদ্ধতিতে বরফ দ্বারা গলদা চিংড়ি সংরক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে/হয় নাই/আবার অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনী-৪

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ি সাধারণত কোন সময়ে আহরণ করা হয়?
২. কত ওজনের চিংড়ি বাজারজাতকরণের জন্য লাভজনক?
৩. গলদা চিংড়ি কয়টি পদ্ধতিতে আহরণ করা হয়?
৪. অনবরত চাষ পদ্ধতিতে পোনা মজুদের কয় মাস পর থেকে সাধারণত চিংড়ি আহরণ করা শুরু হয়?
৫. আহরণকৃত চিংড়ি বরফ মিশ্রিত পানিতে কত সময় ডুবিয়ে রাখতে হয়?
৬. চিংড়ির নতুন খোলস শক্ত হতে সাধারণত কত দিন প্রয়োজন হয়?
৭. পরিবহন সময় ১২-১৮ ঘন্টা হলে বরফ ও চিংড়ি ব্যবহারের অনুপাত কত হবে?
৮. পচন ক্রিয়ার চিংড়ির কোন গুনাবলি নষ্ট হয়?
৯. চিংড়ির পচন রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর নাম কী?
১০. কী কী উপায়ে চিংড়ি শীতলীকরণ করা যায়?
১১. নিম্ন তাপমাত্রায় চিংড়ি সংরক্ষনের পদ্ধতিগুলোর নাম কী?
১২. চিংড়ি কত তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়?
১৩. গলদা চিংড়ি আহরণের উত্তম সময় কোনটি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যে সব কারণে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছার পূর্বেই চিংড়ির গুনগতমান নষ্ট হয় তা বর্ণনা করো।
২. চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৩. বাংলাদেশের চিংড়ি বিপণন ব্যবস্থা বর্ণনা করো।
৪. বিভিন্ন ধরনের হিমায়ক যন্ত্রগুলোর নাম লেখ।
৫. র‍্যানসিডিটি বলতে কী বোঝ?
৬. দ্রুত হিমায়িতকরণ বলতে কী বোঝ?
৭. দ্রুত হিমায়িতকরণের সুবিধাগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ির আহরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
২. গলদা চিংড়ির বাজারজাতকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করো।
৩. চিংড়ির গুনগতমান অক্ষুন্ন রাখার কৌশল বর্ণনা করো।
৪. চিংড়ি শীতলীকরণের উপায়সমূহ বর্ণনা করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

শ্রিম্প কালচার অ্যান্ড ব্রিডিং-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারের ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।